□ প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬
□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ন কলাম।

এই গ্রন্থে প্রখ্যাত ইতালীয় কথা সাহিত্যিক আলবার্তো মোরাভিয়ার কুড়িটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। হয়তো কারো কোনো পছন্দসই গল্প এখানে বাদ গেছে, কিন্তু সংকলনের ক্ষেত্রে এ অসুবিধাটুকু থেকেই যায়। তবুও, নির্বাচিত গল্পগুলি পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই আমার আশা।

বলে রাখা ভালো, গল্পগুলি ইংরেজি অনুবাদের বাংলা ভাষান্তর। ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটির নাম 'রোমান টেলস্' (Roman Tales) যেটি প্রয়োজনবোধে পাঠক পড়ে নিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে মোরাভিয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলে নেওয়া দরকার। আলবার্তো মোরাভিয়া ১৯০৭ সনে রোমে জন্মগ্রহণ করেন। আলবার্তো মোরাভিয়া তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম আলবার্তো পিনচেরার্লে। যৌবনে স্বাস্থ্যহীনতায় যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছেন। তবে এই সময়েই প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। ঔপন্যাসিক নবোকভের মতই বিভিন্ন ভাষায় তিনি পারঙ্গম। মোরাভিয়া সাংবাদিক হিসেবেও এক সময় কাজ করেছেন।

'উদাসীন যারা' (১৯২৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপ জুড়ে মোরাভিয়া লেখক স্বীকৃতি পান। এরপর তিনি রাজনীতির কাজে জড়িয়ে পড়েন। ফ্যাসিস্তরা তাঁর বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৪ সনে ব্রিটিশদের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে আত্মগোপন করেই থাকতে হয়। 'রোমের রমণী' (১৯৪৭) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এখানে এক বারাঙ্গনার কাহিনী নিষ্ঠুর বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। মোরাভিয়ার রচনায় নির্মোহ মনের পরিচয় থাকলেও একটি সিনিকের মনও উঁকিঝুঁকি দেয়।

মোরাভিয়ার গল্প গ্রন্থ (১৯৫৪) তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে। তাঁর গল্পগুলিতে পাঠক আবিষ্কার করবেন এক নতুন মোরাভিয়াকে, যিনি অনাড়ম্বর আয়োজনে ফুটিয়ে তুলেছেন অতি সাধারণ সব মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা। যেখানে অন্তঃসলিলারূপে

কাজ করে যায় প্রেম। রোমনগর কেন্দ্রিক এই গল্পগুলির কুশীলব রোমেরই নগণ্য সব মানুষ (একটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে)—সমাজে যাদের স্থান খুব উঁচুতে নয়। সেই সাধারণ মানুষগুলির কথা খুব সাদামাটা ভঙ্গিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন। তাদের গল্প তাদেরই মুখের ভাষায় লেখা হয়েছে। ছোট ছোট গল্প। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরেই বিচিত্র চরিত্রের মিছিল। বিচিত্র সব পরিস্থিতিতে প্রেমের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে ভাষান্তর সম্পর্কে এটুকুই বলার যে, অনুবাদ যথাসাধ্য স্বচ্ছন্দ করার প্রয়াস যেমন করা হয়েছে তেমনি তা প্রায় সর্বাংশেই মূলানুগ রাখার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সাফল্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার বিচার করবেন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা।

কমল গুপ্ত

ছোটমামা সত্যনারায়ণ সেন-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

□ ইতালিয়া □

লোকটা আমি রোগাটে আর সহজেই ঘাবড়ে যাই। সরু সরু হাত, লম্বা লম্বা ঠ্যাং আর পেটটাতো এত বসা যে কোমরে প্যাণ্ট থাকতে চায় না হড় হড় করে নেমে আসে। অর্থাৎ ভাল একটি লরি ড্রাইভারের কোনো গুণই আমার নেই। লরি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কি? লরি ড্রাইভাররা সবাই বেশ দশাসই চেহারার লোক হয়—ইয়া চওড়া কাঁধ, তাগড়াই হাত, পেট আর পিঠ শক্ত-সমর্থ। লরি ড্রাইভারের এই হাত, পিঠ, পেট এই তিনটি জিনিসই চাই। হাত চাই ষ্টীয়ারিং হুইল ঘোরাবার জন্যে, সাধারণত ষ্টীয়ারিং হুইলের বেড় হাতের প্রায় সমান-সমান হয় আর পাহাড়ি রাস্তায় কখনো কখনো পুরো হুইলটাই ঘোরাতে হয়। জোরদার পিঠ চাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় একভাবে বসে থাকতে হয়। তাই পিঠ ব্যথা করলে বা শক্ত হয়ে গেলে চলে না। এবং শেষমেষ চাই পেট, সীটে সেঁটে বসে থাকতে হবে মাটির বুকে শক্ত পাহাড়ের মত। শারীরিক দিক দিয়ে তো এই ব্যাপার। নৈতিক দিক দিয়ে দেখলে আমার যোগ্যতা আরো কম। লরি ড্রাইভারের কোনরকম স্নায়বিক দুর্বলতা, খামখেয়ালপনা বা ঘরের দিকে পিছুটান থাকলে চলবে না। এককথায় সবরকম সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে হবে। লরি চালানো এত একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর কাজ যে আস্ত একটা ষাঁড়ও ঘায়েল হয়ে যাবে। আর নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামানো চলবে না, এ ব্যাপারে তাকে নাবিকদের মত হতে হবে। তা নয়তো ঐ সর্বক্ষণ আসা-যাওয়ার কাজে সে স্রেফ পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মাথায় নানান চিন্তা ঘুরপাক খায়, মেজাজে আমি মনমরা ও নারীজাতির প্রতি আসক্ত।

এসব সত্ত্বেও আমি লরি ড্রাইভারই হতে চাইলাম, আর একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে চাকরীও জুটিয়ে ফেললাম। আমার সঙ্গী হিসাবে পালোম্‌রি নামে মহা চাষাড়ে এক ছোঁড়াকে দেওয়া হল। ওকেই লরি ড্রাইভার হিসেবে ঠিক ঠিক মানায়। অবিশ্যি তার মানে এই নয় যে লরি ড্রাইভাররা সবাই এক একটি গবেট। কিন্তু ও ছিল একটা আস্ত আকাট আর লরিই ছিল ওর

ধ্যানজ্ঞান। বয়েস তিরিশ পেরিয়ে গেলে কি হয়, বুড়োখোকা ছাড়া ওকে কিছু ভাবা যায় না। গাব্‌দা গোব্‌দা গোলগাল মুখ, বসা কপালের নীচে ছোট্ট দুটি কুতকুতে চোখ, আর মনিব্যাগের মুখের মত এক চিলতে ঠোঁট। মাঝে মাঝে ঘোঁত ঘোঁত করে এক আধটুকু কথা বলা ছাড়া বিশেষ মুখ খোলে না। একমাত্র খাবারের কথা ছাড়া কোন কিছুতেই ওর বিশেষ উৎসাহ দেখা যেত না। একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। নেপ্‌লসে যাবার পথে ইত্‌রির এক সরাইখানায় ঢুকেছি। ক্লান্ত লাগছিল, খিদেও পেয়েছিল বেজায়। খাদ্যবস্তু বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। দেখলাম বীন আর শূয়োরের শুকনো মাংস দিয়ে রান্না করা হয়েছে—এসব আমার চলে না। পালোম্‌বি কিন্তু দুপ্লেট সাবড়ে দিল, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলো। ভাবখানা যেন গভীর কিছু ভাবছে। 'আরো চার প্লেলেট ওড়াতে পারি,' ওর গভীর ব্যক্তব্যটি পেশ করল। এই কথাটা বলতে ওর এতক্ষণ লাগছিল।

এহেন লোক, যে কিনা কাঠ কিংবা পাথর দিয়ে তৈরী হলেই মানাতো ভালো, সেই হলো আমার সর্বক্ষণের সাথী। তাই ইতালিয়ার দেখা পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম। সে সময়টাতে আমরা রোম-নেপ্‌লস সড়কে যাতায়াত করছি, আর নিয়ে যাই প্রায় সবরকমই জিনিসই। ইট, লোহা, নিউজপ্রিন্ট কাঠ, ফল, এমন কি কখনো-সখনো মেয়ের দলও চালান দি। ইতালিয়ার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় তেরাসিনায়। হাত দেখিয়ে লরি থামিয়ে ওকে রোমে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানাল ও। সচরাচর এরকম অনুরোধ আমরা রাখিনা—ওপর থেকে বারণ আছে। কিন্তু ইতালিয়ার দিকে এক নজর তাকিয়ে বুজলাম এ নিয়ম এখানে খাটবে না। ওকে তুলে নিলাম। লাফিয়ে লরিতে উঠতে উঠতে ও বলল : 'বরাবর দেখছি, লরি ড্রাইভাররা ভারী লক্ষ্মী ছেলে হয়।'

ইতালিয়ার চেহারায় চটক আছে, একথা মানতেই হবে। লিকলিকে সরু কোমরের উপর টাইট জাম্পারের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে উদ্ধত বুক। দেখলেই কামড় মারে। লম্বা গলা। ছোট্ট মাথায় বাদামী চুল। একজোড়া সবুজ চোখ। দীর্ঘ শরীরের তুলনায় পা দুটো একটু বাঁকা, হাঁটু বাঁকিয়ে হাঁটছে মনে হয়। ঠিক সুন্দরী না হলেও এমন কিছু ছিল ওর যা মন টানে? প্রমাণ মিলল হাতে-নাতে। তখন আমরা সিস্‌তারনার কাছাকাছি এসে গেছি। পালোম্‌বি লরি চালাচ্ছে। ইতালিয়া ওর হাত আমার হাতে চালান করে

দিল, নিবিড় চাপে টের পেলাম। ভেলেত্রি পৌছনো পর্যন্ত এভাবে চলল। ওখানে পালোম্‌বির কাজ ফুরোলো—আমি ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসলাম। গরমের দিন। বিকেল চারটে-টারটে হবে। সবচেয়ে গরম এ সময়টায়। ঘামে আমাদের হাত পিছলে-পিছলে যাচ্ছিল। থেকে থেকে ওর সবুজ মায়াবী চোখ মেলে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। মনে হল, এতদিন জীবনটা তো অ্যাসফল্টের একটা একঘেয়ে সড়ক ছাড়া কিছু ছিল না, এবার বোধহয় জীবনে আলো আর হাসি ফুটবে। একটি নারী বোধহয় জীবনে এল। সিস্‌তারনা থেকে ভেলেত্রি যাবার পথে পালোম্‌বি নামল গাড়ির চাকাটা দেখতে। এই সুযোগ ছাড়লাম না—ইতালিয়াকে একটা চুমু খেলাম। ভেলেত্রিতে এসে খোশমেজাজেই পালোম্‌বির সঙ্গে জায়গা বদল করলাম। আপাতত একটু হাতে চাপ, ছোট্ট একটা চুমুই যথেষ্ট।

এরপর থেকে ফি হপ্তায় একবার কি দুবার ইতালিয়া নিয়মিত ওকে রোম থেকে তেরাসিনা আর তেরাসিনা থেকে রোমে নিতে যেতে বলতো আমাদের। আমরাও নিয়ে যেতাম। সকালের দিকে ও দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকত। হাতে সব সময়ই স্যুটকেশ বা ঐ জাতীয় কিছু থাকত। আর পালোম্‌বি গাড়ি চালাচ্ছে দেখলে ইতালিয়া সারাটা রাস্তা আমার হাত ছাড়ত না। নেপল্‌স থেকে ফিরে আসার পথে তেরাসিনায় অপেক্ষা করতো ও। গাড়িতে উঠেই হাত জড়িয়ে ধরতো। এমন কি ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে চুমু খেতাম—অবিশ্যি পালোম্‌বিকে লুকিয়ে! সোজা কথা আমি তখন প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ পেয়েছি বহুদিন পর। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ইতালিয়া একটু মুখভার করে তাকালেই বুকটা মুচড়ে ওঠে, বাচ্চা ছেলের মতো চোখে জল এসে পড়ে। জানি পুরুষমানুষের এরকম চোখের জল ফেলা মানায় না, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারিনা যে। গাড়ি চালাতে চালাতে নীচু গলায় বাক্যালাপ চালাতাম আর পালোম্‌বি ব্যাটা পড়ে পড়ে ঘুমোত। কি অত কথা বলতাম কে জানে। নিছক প্রেমালাপে যেমন হয় তেমনি কতো অর্থহীন কথা হয়তো বলে গেছি। তবে এটুকু মনে আছে, সময় কখন কেটে যেত —যে পথ আগে কখনো ফুরবে না বলে মনে হত তা যেন কখন ছোট্ট হয়ে গেল জাদুবলে। গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিতাম। এমন কি গরুর গাড়িও বেরিয়ে যেত পাশ দিয়ে। জায়গায় পৌছতাম অবশ্য সময়মতই। ইতালিয়া

নেমে পড়ত। রাত্তিরে খুব মজা হত। লরি যেন আপ্‌সে চলতো আমার এক হাত থাকতো স্টীয়ারিংয়ে আরেক হাত ইতালিয়ার কোমর জড়িয়ে। দূরে অন্য গাড়ির আলো সংকেত জানিয়ে যখন নিভত জ্বলতো, মনে হত আমিও আমার গাড়ির আলো এমনভাবে নেভাই জ্বালাই যাতে ওরা বোঝে আমার মন খুশীতে ভরপুর। যেন এই কথা ওরা ওই সংকেতে দেখতে পায়ঃ "আমি ইতালিয়াকে ভালোবাসি, ইতালিয়া ভালোবাসে আমাকে।"

পালোম্‌বিকে দেখে মনে হত, হয় ও কিছুই দেখেনি, নয়তো না দেখার ভান করে আছে। ইতালিয়া যে এত ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেছিল সেজন্যে এতটুকু আপত্তি কখনো সে করেনি। ইতালিয়া যখন গাড়িতে উঠত ও তখন তাকে ঘোঁত-ঘোঁত করে সম্ভাষণ জানবার মত করে বসবার জায়গা করে দিত। ইতালিয়া সবসময় মাঝখানে বসত। কারণ অন্য গাড়ি ওভারটেক করতে গেলে পালোম্‌বিকে দেখতে হত রাস্তা ঠিক আছে কিনা। এমন কি ইতালিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন একটা কথা যখন উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচের উপর লিখলাম তখনো পালোম্‌বি মুখ খুললো না। অনেক ভেবেচিন্তে শাদা হরফে লিখলামঃ' 'ইতালিয়া দীর্ঘজীবী হোক।' কিন্তু পালোম্‌বিটা এমন হাঁদা, কথাটার যে দুটো মানে হয় তা টের পেল না। অন্য লরি ড্রাইভাররা ঠাট্টা করে বলতে লাগল হঠাৎ আমরা এত দেশভক্ত হয়ে উঠলাম কেন। একমাত্র তখনই হাঁদারামের হাঁ-করা মুখে ধীরে ধীরে হাসির দেখা দিল। বললঃ 'ওরা ভাবে ইতালিদেশের কথা লিখেছো, আসলে তো মেয়েটা···মাথায় বুদ্ধি আছে তোমার।'

এভাবে মাস দুয়েক কি তারও বেশী গড়িয়ে গেল। এরপর একদিন আমরা ইতালিয়াকে যথারীতি তেরাসিনায় নামিয়ে নেপ্‌লসে পৌছে দেখি জিনিসপত্র খালাস করে তখুনি আমাদের রোমে ফেরবার তলব পড়েছে। নেপ্‌লসে রাত কাটাবার দরকার নেই। মেজাজটা বিগড়ে গেল। কেননা পরদিন সকালে ইতালিয়ার সঙ্গে দেখা হবার কথা। কিন্তু কি করা যাবে হুকুম তো মানতেই হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। স্টীয়ারিং ধরে বসলাম আর পালোম্‌বি পড়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগল। ইত্‌রি পর্যন্ত ঠিকই চলল সব কিছু—বহু বাঁক এ-রাস্তাটায়। আর রাত্তিরে লরি ড্রাইভারের শরীর যখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে তখন রাস্তার বাঁকই তাকে সজাগ রাখে, প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে। কিন্তু ইত্‌রি পেরিয়ে ফন্‌দি-র কমলা-বাগিচার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে

এল, জেগে থাকার জন্য তখন ইতালিয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম। ভাবতে ভাবতে দেখলাম ইতালিয়ার চিন্তা বনের শাখা-প্রশাখার মত জট পাকাতে পাকাতে এক জমাট অন্ধকারে গিয়ে শেষ হয়েছে। হঠাৎ নিজের মনে বলে উঠেছিলাম মনে আছে: 'ভাগ্যিস্ ইতালিয়ার কথা ভাবছিলাম তাই জেগে আছি, নয়তো কখন ঘুমিয়ে পড়তাম।' বলা বাহুল্য আমি ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর চিন্তাটা এসেছিল ঘুমের মধ্যে। এতে ঘুম আরো জেঁকে এল। প্রায় এমন সময়েই টের পেলাম লরিটা রাস্তা ছেড়ে একটা গাড্ডায় পড়ে যাচ্ছে। পেছনের ট্রেলারটা উল্টে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে আওয়াজ কানে এল। লরিটা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল বলে রক্ষে, তাই আমরা চোট পাইনি। কোনমতে বেরিয়ে এসে দেখি ট্রেলারটা একদম উলটে গেছে, চাকা শূন্যে, আর রং-করা চামড়ার বোঝা গাড্গায় পড়ে আছে। চা'রদিক অন্ধকার, চাঁদ নেই, তারাভরা আকাশ। দৈবাৎ আমরা তেরাসিনার কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। ডানদিকে খাড়া পাহাড় আর বাঁ দিকে আঙুর বাগান ছাড়িয়ে নিস্তরঙ্গ কালো সমুদ্র।

পালোম্‌বি শুধু বলল: 'কাণ্ডটা করে ছাড়লে যা হোক।' তারপর জানাল তেরাসিনা থেকে আমাদের সাহায্য চাইতে হবে। আর তক্ষুণি হেঁটেই রওনা লাগাল। রাস্তা বেশী দূরে নয়, কাছেই তেরাসিনার কাছাকাছি আসতেই পালোম্‌বির খাই-খাই ভাব যথারীতি জেগে উঠল। বলল, ব্রেকডাউন ক্রেন আসতে বেশ কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে, তাই ততক্ষণে আমরা একটা সরাইখানায় ঢুকে কিছু খেয়ে নিতে পারি। শহরে পৌঁছে একটা সরাইখানার খোঁজে লেগে গেলাম। কিন্তু ঐ সারা-রাত্তিরে একটি মাত্র কাফে ছাড়া আর সব দরজায় তখন ঝাঁপ পড়ে গেছে। কাফেটাও বন্ধ হব-হব করছে। সমুদ্রমুখী ছোট একটা রাস্তা ধরে কিছুদূর হাঁটতেই একটা আলো আর সাইনবোর্ড লাগানো দরজা নজরে পড়ল। মন আমাদের আশায় দুলে উঠলো। পা চালিয়ে এগিয়ে দেখি একটা সরাইখানাই বটে। তবে দেখলাম খড়খড়ি নেমে যাচ্ছে, দোকান বন্ধ হবার মুখে। কাঁচের দরজায় খড়খড়ি পড়লেও ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। 'বোঝাই যাচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে', বলতে বলতে পালোম্‌বি ভেতরে উঁকি মারল। আমিও ঝুঁকে পড়লাম। অনেকটা গ্রাম্য সরাইখানার মত বড়সড় একটা ঘরে একটা কাউণ্টার আর কিছু টেবিল রয়েছে দেখলাম। চেয়ারগুলো সব টেবিলের উপর উল্টে

রাখা। মাঝখানে বিরাজমানা ইতালিয়া স্বয়ং—ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। ঘরের এক ধারে কাউন্টারের পেছনে একটা কুঁজোলোক দাঁড়িয়ে আছে। কুঁজো এর আগেও দেখেছি, কিন্তু এমন নিখুঁত কুঁজো এর আগে দেখিনি। হাত দুটোর মাঝখানে বসানো মুখ আর পিঠের কুঁজ ছাড়িয়ে গেছে মাথাকে। ইতালিয়ার দিকে ও বিষ চোখে চেয়েছিল। চঞ্চল ভঙ্গিতে ইতালিয়া ঘরের মেঝে সাফ করছিল। কুঁজোটা না নড়েই কি যেন বলল, ইতালিয়া ঝাঁটা কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে গলা জড়িয়ে ধরে ওকে নিবিড়ভাবে চুমু খেল। ফের ঝাঁটা নিয়ে ও ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল। দেখে মনে হল যেন নাচছে ইতালিয়া। কুঁজোটা কাউন্টার থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে এল। ভালভাবে দেখে বুঝলাম ও জাহাজী লোক। পায়ে স্যাণ্ডাল, পরনে নীলরঙা ছেলেদের ট্রাউজার আর বুকখোলা শার্ট। লোকটা দরজার কাছে আসতেই আমরা সরে দাঁড়ালাম। ও কাঁচের দরজাটা খুলে ভেতর থেকে খড়খড়ি ফেলে দিল।

'এ যে দেখেও বিশ্বাস হয় না', আমি বললাম। মনের চাঞ্চল্য চাপতে হবে তো। পালোম্‌বি শুনে বলল : 'তাই বটে।' ওর বলার ধরনে যে তিক্ততা ফুটে উঠল তাতে অবাক হলাম। গ্যারেজে গিয়ে লরিটাকে খাড়া করে ছড়িয়ে-পড়া চামড়া ফের তুলে ওঠাতে ওঠাতে বাকি রাতটা কেটে গেল। ভোরবেলা রোমের রাস্তায় পাড়ি জমাতে পালোম্‌বি মুখ খুলল। আমি অন্তত যদ্দিন ওকে জানি এই প্রথম ওকে যাকে বলে কথা বলা তাই বলতে শুনলাম। 'দেখলে কাণ্ডটা' ও বললো, "কুত্তী মাগীটা কী ক্ষতিটাই করলে আমার ?"

'তার মানে ?' আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'কতো কথাই না ও আমায় বলেছে।' টেনে টেনে ওর একঘেয়ে ধরনে পালোম্‌বি বলে চলল : 'তাছাড়া যাতায়াতের সময়ে সবসময়ই তো ওর হাত আমার হাতে ধরা থাকত। আমি ওকে বিয়ে করব বলেছিলাম—ও আমার একরকম বাগদত্তা ছিল বলতে গেলে। শেষকালে কিনা একটা কুঁজোকে—'

পালোম্‌বির কথা শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। চুপ করে রইলাম। পালোম্‌বি বলে চলল : 'কতো সুন্দর সুন্দর উপহারই না দিয়েছি—প্রবালের একটা নেকলেস, সিল্‌কের স্কার্ফ, পাতলা চামড়ার এক জোড়া জুতো···মাইরি বলছি, ওকে আমার দারুণ ভালো লাগত। তাছাড়া আমার সঙ্গে ওকে খাসা মানাত।

মাগীটা এমন হারামি কে জানত…'

আপন মনে পালোম্‌বি গজগজ করে চলল। ভোর তখন সবে ফুটছে আর আমাদের লরি ছুটছে রোমের দিকে। বুঝতে বাকি রইল না ইতালিয়া আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে। আর এই করে রেলের টিকিটের পয়সা সে বাঁচিয়েছে। যা আমারই মনের কথা সেই কথা পালোম্‌বির মুখে শুনতে খুব খারাপ লাগছিল। তাছাড়া যার মুখে কথাই যোগাত না তার মুখে এত কথা কেমন বেমানান ঠেকছিল। শেষকালে আর থাকতে না পেরে বললাম: 'দয়া করে থামো এবার। ঐতো হাড়গিলে চেহারা, ওর কথায় অত দরকার কিসের? 'ঘুমুতে দাও।' বেচারা পালোম্‌বি জবাবে বলল: 'তা থামছি। 'কিন্তু মন মানে কই।' এরপর সারা রাস্তা ও আর মুখ খোলেনি।

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পরেও পালোম্‌বি মনমরা হয়ে রইল। আমার জীবন ফিরে এল আগের জীবনে আবার সেই রাস্তা যে রাস্তা আর ফুরোতে চায়না, দিনে যা দুবার পারাপার করছি। একদিন দেখলাম ঠিক নেপ্‌লস রোডের ওপরই ইতাইয়া এক মদের দোকান খুলে বসেছে। সেইদিনই লরি চালানো ছেড়ে দিলাম। দোকানের নাম দিয়েছে "লরি ড্রাইভারের পান্থপাদপ।" পান্থপাদপ বই কি! বলা বাহুল্য আমরা কোনদিনই ঐ পান্থপাদপের তলায় আশ্রয় নিইনি। তবে যখন চোখে পড়ত কাউণ্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ইতালিয়া, আর কুঁজোটা ওর হাতে মদের বোতল আর গেলাস তুলে দিচ্ছে একে একে তখন বুকটা টনটন করে উঠত। নিজেকে সরিয়ে নিলাম আমি। "ইতালিয়া দীর্ঘজীবী হোক" লেখা লরিটা অবিশ্যি এখনো চলে ও পথে—চালায় পালোম্‌বি।

☐ বৃষ্টিঝরা সেই সকালে ☐

শিগগিরই আমি ম'তে মারিনোতে ফিরে যাবো। ফিরে যাবো অস্তেরিয়া ক্যাশ্চিয়তোরিতে। কিন্তু একা যাবো না। যাবো বন্ধুদের, রোববারের ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। অর্থাৎ ওরা যারা কন্সার্ট-টন্সার্ট বাজায় তেমন জমাটি বন্ধুদের নিয়ে। আর মেয়েটেয়ে না জুটলে আমরা বন্ধুরা মিলেই নাচবো। একা ওখানে যাবার হিম্মত আমার আর নেই। রাত্রিতে স্বপ্নে আমি মাঝে-মাঝেই সরাইখানার সেই টেবিলগুলোকে দেখি। দেখি যে মাসের তপ্ত বারিধারা টেবিলগুলোর উপর ঝরে ঝরে পড়ছে। ভ্রুকুটি-কুটিল গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়েছে টেবিলের উপর। পেছনে গাছের ফাঁকে দেখা যায় মেঘের ভেসে যাওয়া। মেঘের নীচে চোখে পড়ে পড়ে রোম-নগরীর ঘর-বাড়ির বিস্তীর্ন দৃশ্য। বাড়ীঅলা তোচ্চির গলা অবিকল কানে বাজে, যেমন শুনেছিলাম সেই সকালে। রেগে রেগে সে সেলার থেকে ডাকছে: "ডার্স, ডার্স।" এবং ডার্সকেও যেন দেখতে পাই চোখের সামনে। আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে সেলারের দিকে পা বাড়াল সে। সিঁড়ি দিয়ে গটমট করে ওর নেমে যাওয়ার আওয়াজও যেন শুনতে পাই।

ওদের ওখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলুম আমি। গাঁয়ের থেকে সবে রোমে এসেছি। ওরা যখন আমায় ওয়েটারের কাজটা দিল তখন ভাবলুম, "টাকাকড়ি না পেলেও পরিবারের একজন হিসাবে তো থাকতে পারবো, তাই বা কম কী? কিন্তু বাপ্‌স, কী একখানা পরিবার! পরিবার নয়তো যেন সাক্ষাৎ নরকে এসে পড়লাম আর কি! বাড়ীঅলাটি দেখতে মোটাসোটা গোলগাল, যেন একতাল মাখনের দলা। কিন্তু বিশ্রী মেজাজ। ওর চওড়া মুখটায় একটা পাঁশুটে ভাব ছিল। মেদ বেড়ে গিয়ে সারা মুখে সূক্ষ্ম বলিরেখা ছড়ানো। কুতকুতে ছোট ছোট চোখ দুটো দেখাতো সাপের চোখের মত। সর্বদাই ওয়েস্টকোট আর শার্টস্লীভ পরা। ছাইরঙা একটা টুপি চোখের কাছাকাছি নামানো। ওর মেয়ে ডার্সের চরিত্তির অবিশ্যি ওর বাপের চেয়ে কোন অংশেই সুবিধের ছিল না। ডার্সও রুক্ষ স্বভাবের, তিরিক্ষি মেজাজের। কিন্তু দেখতে সুন্দরী ছিল

সে। ওর চলার ভঙ্গিমায় যেন ফুটে উঠত এই ভাবটি: এই সুন্দর পৃথিবী আমারই জন্যে। চওড়া মুখে কালো চোখ কালো চুল ছিল মেয়েটার। কিন্তু অসম্ভব ফ্যাকাশে। ঐ বাড়িটাতে একমাত্র মায়ের স্বভাবটাই ছিল হয়ত কিছুটা নরম-সরম। ওর বয়েস চল্লিশের মত হলেও দেখাতো ষাট বছরের বুড়ীর মত। রোগা পাতলা চেহারা। কিন্তু বোধ করি বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই বড় ছিল না। রান্নার উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর সমস্তটা মুখ চাপা নীরব হাসিতে ভরে যাওয়ার ভাব দেখে তো তাই মনে হত। ঘুরে দাঁড়ালে একটা দাঁত ছাড়া কিছুই চোখে পড়ত না।

রাস্তার দিকে মুখ ছিল সরাইখানাটার। খিলানের ধাঁচে একটা সাইনবোর্ড ঝোলান ছিল অস্তেরিয় দ্য ক্যমিয়াতোরি—মালিক, আন্তনিও তোচ্চিঁ।—কথা কয়টি টকটকে লাল রঙের ওপরে হলদে হরফে লেখা ছিল। দোরগোড়া থেকে টেবিল পর্যন্ত একটা পথ ছিল। টেবিলগুলো থাকত গাছতলায়। সামনে দেখা যেত রোমের দৃশ্য। ওদের থাকবার বাড়িটা অবশ্য গ্রাম্য গোছের ছিল। চারদিকে শুধু চারটি দেয়াল, জানলা-টালনার বালাই বিশেষ ছিল না, মাথায় টালির ছাদ। গরম কালটাই ছিল সেরা সময়। দলে দলে সবাই আসত সকাল থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গোটা পরিবার, প্রেমিক-প্রেমিকা, আবার দল বেঁধেও আসত কেউ কেউ। টেবিলের কাছে বসে তোচ্চির খানা আর মদ খেতে খেতে দৃশ্যের শোভা দেখত। আমার কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ থাকত না। আমরা দুটি লোক সর্বক্ষণ খাবার পরিবেশন করে যেতাম। মা-মেয়ে দিনরাত রান্না আর ধোয়া মোছা নিয়ে থাকত। সন্ধ্যেবেলা এত ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়তাম যে কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতাম না পর্যন্ত। কিন্তু শীতকালে বা কোনো ভাল সময়েও বৃষ্টি হলে ঝামেলা শুরু হত। বাপ মেয়ে দুজন দুজনকে বিষ নজরে দেখত তাই নয়, পারলে মেরে পর্যন্ত ফেলত। বাপটি ছিল যেমন দুর্দান্ত তেমনি নীচ আর নির্বোধ। তুচ্ছ কারণেই এলোপাথারি ঘুঁষি চালাতে আরম্ভ করত। মেয়েটা ছিল দারুণ শক্ত আর গোপনতাপ্রিয়। ওর কথাই শেষ কথা এমন একটা ভাবও ছিল। তাছাড়া যেমন উদ্ধত তেমন একগুঁয়ে। দুজন দুজনকে এমন ভীষণ ঘেন্না করবার কারণটা ছিল বোধহয় এই যে দুজনের শিরায় একই রক্ত বইছিল। আর কে না জানে রক্তের সম্পর্ক যেখানে, ঘৃণার প্রকাশ সেখানে সবচেয়ে ভয়াবহ। কিন্তু ওদের ঘৃণার পিছনে অন্য কারণও ছিল-সে

কারণটা স্বার্থের। মেয়েটার নজরটা ছিল একটু উঁচু। ও বলত, সরাইখানা থেকে রোমের ঐ চমৎকার দৃশ্য দেখতে পারাটা আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু তা লাগানো হচ্ছেনা। ওর মতে ওর বাবার উচিত ওখানে একটা সিমেণ্ট বাঁধানো নাচের জায়গা তৈরী করা। সেই সঙ্গে একটি ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা রাখা, চীনে লণ্ঠন ঝোলানো এসবও চাই। শুধু তাই নয়, বাড়ীটাকে একটা আধুনিক রেস্তরাঁ করে ফেলতে হবে—নাম হবে 'প্যানোরামা রেস্তরাঁ।' কিন্তু বাপ সে প্রস্তাবে রাজী নয়। তার কারণ প্রথমত সে ছিল ছোটমনা এবং সবরকম নতুনত্বের বিরোধী আর দ্বিতীয়ত পরামর্শটা এসেছিল মেয়ের কাছ থেকে। সে বরং নিজের গলা নিজে কেটে ফেলবে তবু মেয়ের কাছে হার স্বীকার করা—নৈব নৈব চ। বাপ মেয়ের ঝগড়াটা হত খাবার টেবিলে বসে। মেয়েটা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে—যেমন, বাপ খাবার সময়ে ঢেঁকুর তুলেছে—বিচ্ছিরিভাবে আক্রমন জুড়ে দিত। বাপ সেই কথার চোখা চোখা জবাব দিত, গালিগালাজ করত। মেয়েটা তবু গোঁ ছাড়ত না। বাপ তখন গালে চড় কষিয়ে দিত। মুখ দেখে মনে হত মেয়েকে মেরে রীতিমতো আনন্দ পাচ্ছে সে। এদিকে মেয়েটার ভাব দেখে মনে হত ঐ কিলগুলোই যেন ওর কাছে ফুলের ওপর নবধারা জলের মত। ঘেন্নায় ও নোংরামিতে ও আরো ফুঁসে ফুঁসে উঠত। বাপ তখন মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে কিলবৃষ্টি শুরু করে দিত। থালা গেলাস ঝনঝন করে মেঝেয় পড়ে যেত। মা ছুটে আসত, সেই কিরকম বোকা বোকা মুখ করে বাধা দিতে চাইত, দন্তহীন মুখে লেগে থাকত সেই সনাতন হাসিটা। আর আমি রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়তাম। লা ক্যামিল্লুচিয়ার পথ ধরে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিতাম।

ঐ বাড়ি থেকে কবে কেটে পড়তুম, কিন্তু মুশকিল হল ইতিমধ্যে ডার্সের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলুম। একটুতেই প্রেমে পড়বার পাত্র আমি নই। যাকে বলে বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন তেমন লোক আমি। আলাপ সালাপ হাবভাবে পটে যাবার লোক নই। কিন্তু শুধু কথাবার্তা হাবভাব নয়, একটি নারী যখন তার সবটুকু দিয়ে বসে, তার রক্তমাংস নিয়ে হাজির হয়, একটি পুরুষমানুষ তখন আর ধরা না দিয়ে পারেনা। সেই জাল সে ছেঁড়বার যত চেষ্টা করে তত জোরে আরো সেই জাল তাকে জড়িয়ে ধরে। আমাকে চেনবার আগেই ডার্সের এমন

ধারা মতিগতি হয়েছিল নিশ্চয়। আর আমি না হয়ে অন্য লোক হলেও ব্যাপারটা একই দাঁড়াত। কারণ ওদের ওখানে যাবার প্রথম রাত্তিরেই আমার ঘরে এসেছিল ও। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় ও আমাকে টেনে তুললো—অবসাদ থেকে এক আবেগতপ্ত মুহূর্তে নিয়ে এলো পলকে। তখনো বুঝতে পারছিনা একি স্বপ্ন না সত্যি? অথচ আমাদের দুজনের মধ্যে কোনরকম কথাবার্তা, চোখের ভাষা বিনিময়, হাত ছোঁওয়াছুঁয়ি—অর্থাৎ কিনা প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমনিবেদনের জন্যে যেসব কলাকৌশলের আশ্রয় নেয়—তার কিছুই কিন্তু হয়নি। একটা শস্তা খেলো চরিত্রের মেয়েমানুষের সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে অনেকটা সেই রকমই হয়েছিল। তফাৎ এই, ডার্স মোটেই খেলো চরিত্রের মেয়ে ছিল না। বরং সচ্চরিত্রা মেজাজী মেয়ে বলেই সবাই তাকে জানত। আর এখানেই হয়েছিল আমার মরণ, এই ফাঁদেই আমি পা দিয়েছিলাম।

এমনিতে আমার স্বভাব ধীরস্থির ও বিবেচনাশীল। কিন্তু কেউ আমাকে ঘাঁটালে মুহূর্তে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমার চেহারাতেই তার ছাপ আছে। আমার ফরসা ফ্যাকাশে মুখটা একটুতেই লাল হয়ে যায়। ডার্সের ব্যবহারে আমি বিরক্ত হতাম। কারণটা বুঝতে দেরী হল না। ও চাইত ওর হয়ে ওর বাবার বিরুদ্ধে আমি লড়ি। ওতো একদিন বলেই বসল আমি নাকি কাপুরুষ। কারণ আমার সামনেই ওর বাপ ওকে মারধোর করে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখি। একবার যেমন, বাপটা ওকে মাটিতে ফেলে তো লাথিই মারতে শুরু করে দিল। অবিশ্যি আমি বলি না যে ডার্সের কথায় সত্যতা নেই। সত্যি কথাই তো, প্রেমিক হিসেবে ওকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি বিলক্ষণ টের পেতাম ডার্সের মনে অন্য মতলবও ছিল। যাই হোক, কাপুরুষ বলাতে বা ওর মতলববাজিতে যে কারণেই হোক একদিন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। একদিন দেখলাম ডার্স ওর কথার সুর পালটে ফেলেছে। বিয়ে করে দুজনে মিলে 'প্যানোরামা রেস্তরাঁ'টা খুললে কী মজা হয়, এধরনের কথা শোনাতে লাগল। ডার্স যেন একেবারে সোনামেয়ে হয়ে গেল। কী নম্র, কী মিষ্টি কথা। আমাদের প্রেমপর্বের সেটাই যাকে বলে স্বর্ণযুগ। ডার্সকে ডার্স বলেই চেনা যেত না। মনে মনে ভাবলাম ব্যাপারটায় কোথাও গোলমেলে কিছু আছে। যা ভেবেছি তাই। হঠাৎ ডার্সের সুর ফের

পালটে গেল। বিয়ে করি চাই নাই করি বাপ বেঁচে থাকতে কিস্যু হবার জো নেই। অর্থাৎ সোজা কথায় বাপকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। ঠিক প্রথম দিন রাত্রে যেমন আমার ঘরে ঢুকেছিল—কোন ভূমিকা বা ভণিতা না করেই—তেমনিভাবে এ প্রস্তাবটাও সরাসরি আমার দিকে ছুঁড়ে দিল সে। এবার ভেবে ছাখো, এই কথাটুকু শুধু মুখ ফুটে বলল না।

পরদিনই ওকে বললাম, ও যদি ভেবে থাকে যে এধরনের কাজে আমি ওর সহায় হবো তবে মস্ত ভুল করেছে সে। জবাবে সে জানালো, তাই যদি হয় তবে আমার চটপট কেটে পড়াই ভালো। আমাকে দিয়ে তবে ওর কোনো দরকার নেই। যেই কথা সেই কাজ। সেইদিন থেকে আমার দিকে ও ফিরেও তাকাত না। এমন কি বাক্যালাপও বন্ধ হয়ে গেল আমাদের। এর ফলে ডার্সের বাপ আমার দুচক্ষের বিষ হয়ে গেল। কারণ আমার মনে হল দোষটা আসলে তারই। রোজ সে ঐ সময়টাতেই ঝগড়া জুড়ে দিত। ওকে ঘেন্না করা হোক এই যেন লোকটা চাইত।

সময়টা তখন মে মাস। এই সময়েই দলে দলে সব আসত মদ আর নতুন বীন খেতে। এদিকে ঘন সবুজে ঢাকা গ্রামাঞ্চলে একটানা প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। তাই সরাইখানায় একটা কুকুরের দেখা পাওয়াও ভার হয়ে উঠল। বাপটির মেজাজ সর্বক্ষণই খিঁচড়ে রইল। একদিন খাবার একপাশে সরিয়ে রেখে ডার্সকে সে বলে উঠল: 'এইসব জঘন্য চটচটে স্যুপ তুই ইচ্ছে করে আমার পাতে তুলে দিস।' 'ইচ্ছে করেই যদি তুলে দিতাম তো বিষ তুলে দিতাম।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা জবাব দিল। বাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকালে। অ্যায়সা এক চড় কষিয়ে দিলে মুখে যে চিরুণীটা চুল থেকে ছিটকে পড়ে গেল। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে তখন। প্রায় অন্ধকারেই আমরা বসে ছিলুম। সেই অন্ধকারেই দেখলাম ডার্সের মুখটা পাথরের মত স্থির। যে পাশ দিয়ে চিরুনীটা পড়ে গেছল সেই দিকের চুলটা ধীরে ধীরে খুলে এলো। এক খোকা ঘুমভাঙ্গা সাপ যেন জেগে উঠল মনে হল। তোচ্চিকে বলে উঠলাম: তুমি কি দয়া করে মারধোরটা বন্ধ করবে? 'তুমি নাক গলাবার কে হে?' সাফ জবাব এল। সঙ্গে সঙ্গে একটু অবাকও হল সে। কেননা এই সর্বপ্রথম ওদের ব্যাপারে আমি কথা বলেছি। সেই মুহূর্তে আমার মনে বেশ একটা আত্মশ্লাঘার ভাব হল। মনে হল যেন একটা অসহায় প্রাণীকে আগলাচ্ছি। আসলে অবশ্য

ব্যাপারটা মোটেও তা ছিল না। এও মনে হল, এভাবেই ডার্সকে আবার আমি ফিরে পাবো। তাই চেঁচিয়ে উঠলাম: 'মারধোর তোমাকে থামাতেই হবে, বুঝেছো? ওসব আমি বরদাস্ত করবো না।' আমি তখন রাগে গরগর করছি। মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। টের পেলাম ডার্স টেবিলের তলায় আমার হাতটা ওর হাতে তুলে নিয়েছে। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তোচ্চি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল: 'এই নে, তোর জন্যে এটি।'

সে আমার গালে এক বিরাশি শিককা কষিয়ে দিল। একটা মদের গ্লাস টেনে নিলাম আমি। যেটুকু মদ ছিল তোচ্চির মুখে ছুঁড়ে দিলাম। যে ভঙ্গীতে মদটা ছুঁড়লাম সেটা আমার এত পছন্দ হয়ে গেছল মনে হল মাসখানেক ধরে যেন ওটার মহলা দিচ্ছিলাম মনে মনে। মদটা তোচ্চির সারামুখে ছড়াছড়ি আর ডার্সের হয়ে আমি লড়ছি। ব্যস, সিঁড়ি ধরে দে ছুট। শুনতে পেলাম পেছন থেকে তোচ্চি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে: 'আমি তোকে খুন করব, ব্যাটা নচ্ছার বাউণ্ডুলে!' আমি আমার ঘরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম বৃষ্টি পড়ছে। রাগ তখনো পড়েনি। রাগের মাথায় ড্রয়ারে রাখা ছুরিটা বার করে জানলার পাল্লায় এমন জোরে বসিয়ে দিলাম যে ফলাটা ভেঙে গেল।

আমরা থাকতুম মঁতে মারিওতে। মনে হত, এখানে যেন একটা অশুভ সংকেত ঝুলে আছে। রোমে থাকলে হয়ত ওতে আমি রাজী হতুম না। কিন্তু ঐ জায়গাটায় যেন সবই সহজ। সবই সম্ভব। যে কাজটা আগের দিনও আমার কাছে ছিল অসম্ভব ব্যাপার পরের দিনই সেটা আর অসম্ভব রইলো না। ডার্স আর আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। দুজনে আমরা দিনক্ষণ এবং উপায় ঠিক করতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। তোচ্চি রোজ সকালবেলা সেলারে নামত রোজকার মদ নিয়ে আসতে। সঙ্গে থাকত ডার্স মদ ভরবার একটা বড় বোতল নিয়ে। মাটির তলায় সেলারটা। ওখানে যেতে হলে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামতে হত: সিঁড়িটা একটা ফ্রেমের ওপরে দেয়ালে ঠেসান দেওয়া। গোটা সাতেক ধাপ তো সিঁড়িটায় ছিলই। ঠিক হল, আমিও ওদের সঙ্গে সেলারে নামব। তোচ্চি যখন মদের পিপে ফুটো করবার জন্যে সামনে ঝুঁকবে আমি তখন আগুন খোঁচাবার লোহার রডটা পেছন থেকে ওর মাথা বরাবর মারবো। তারপর সিঁড়িটা খুলে ফেলে দিয়ে বলবো তোচ্চি পড়ে গিয়ে মাথার খুলি ভেঙ্গে

ফেলেছে। একাজে আমার সায় ছিলও আবার ছিলও না। কিন্তু আমি তখন বেজায় রেগে। বললাম: ঠিক আছে। আমি করবো। আমি যে ভয় পাইনি এটা দেখাতেই কাজটা করতে হবে আমাকে। কিন্তু করেই আমি কেটে পড়বো, আর ফিরবো না। "তাহলে তোমার কিছু না করে চটপট কেটে পড়াই ভালো। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে হারাতে রাজী নই।" ডার্স জানত কখন প্রেমাভিনয় করতে হয় না হয়। আর দরকার হলে তা করত। ডার্সকে বললাম, কাজটা আমি করবো আর করে কেটেও পড়বো না-দুজনে মিলে রেস্তরাঁটা খুলবো।

নির্দিষ্ট দিনে তোচ্চি ডার্সকে বড় বোতলটা আনতে বলে সেলারের দিকে পা বাড়াল। সেলারের দরজাটা ছিল বাড়ীর কিছুটা দূরে একটা কোনায়। যথারীতি বৃষ্টি পড়ছিল। সরাইখানার ভেতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ডার্স বড় বোতলটা নিয়ে বাপের পেছন পেছন রওনা দিল। কিন্তু সেলারে ঢোকার আগে আমার দিকে চেয়ে পরিষ্কার একটা ইঙ্গিত করল। ডার্সের মা ষ্টোভের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ইঙ্গিতটা তার চোখে পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে সে তাকিয়ে রইল। আমি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। ফায়ারপ্লেস থেকে খোঁচাবার রডটা নিয়ে ডার্সের মায়ের সামনে দিয়েই বেরিয়ে এলাম। সে একবার আমার দিকে একবার ডার্সের দিকে তাকাল। দুচোখে তার অনেক কথা ফুটে উঠলেও সে যে মুখ খুলবে না সেটা বোঝা গেল। ডার্সের বাপ সেলার থেকে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল: "ডার্স, ডার্স।" ডার্স জবাব দিল, "আসছি।" ওর সুডৌল শাদা গলাটা বাঁকিয়ে অপূর্ব ভঙ্গীতে ডার্স যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল, মনে আছে, সেই শেষবারের মতো ওর ওই অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাগানের দিকে যাবার দরজাটা খুলে গেল। ভিজে বস্তা কাঁধে যে লোকটা ঢুকলো সে একটা গাড়োয়ান। আমার দিকে না তাকিয়েই লোকটা বলে উঠল: "আমায় একটু সাহায্য করতো ভাই।" আমার হাতে তখনো সেই রডটা। যন্ত্রচালিতের মত আমি ওর পিছন-পিছন গেলাম। কাছেই একটা খামার বাড়িতে আস্তাবল তৈরি হচ্ছিল। লোকটার পাথরে বোঝাই গাড়িটা গেটের কাছে কাদায় বসে গেছল। ঘোড়াটা টানতে পারছিল না।

গাড়োয়ানের চেহারাটা কুৎসিত, বিকৃত, পাশবিক। তার উপর রাগে সে তখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য। তাই ওকে আরো বীভৎস দেখাচ্ছিল। রডটা

আমি একটা গেটপোস্টের মাথায় তুলে রাখলাম। দুটো পাথর গাড়ির চাকার তলায় রেখে পেছন থেকে আমি ধাক্কা দিলাম, আর গাড়োয়ানটা লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে লাগল সামনের দিকে। সবুজ নিবিড় এল্ডার ঝোপে ফুলময় অ্যাকেশিয়ার উপর অবিরল ধারায় বর্ষণ হচ্ছিল। ফুলের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে ছিল চারদিকে। এদিকে গাড়িটা কিন্তু একচুল নড়ল না। গাড়োয়ানটা দিব্যি গালছিল। চাবুকের হাতলটা দিয়ে সে ঘোড়াটাকে পেটাতে শুরু করল। এক জিঘাংসা যেন ওকে পেয়ে বসল। গেটপোস্টের উপর যে রডটা আমি রেখেছিলাম সেটাকে সে বাগিয়ে ধরলে। একটু নজর করে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না ওর অত রাগের কারণ গাড়িটা নড়ছিল না বলে মোটেই নয়। আসলে নিজের জীবনটার ওপর একটা ধিক্কার এসে গিয়েছিল লোকটার। ঘোড়াটা আর ঘোড়া ছিল না—একটা লোকের মত হয়ে গেছল। আর সেই লোকটাকেই ও এতটা ঘেন্না করছিল। ও আবার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে, আমি মনে মনে ভাবলাম। প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম ঃ না-না, রডটা ধরবে না। কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেলাম। ভাবলাম, ও যদি ঘোড়াটাকে মেরে ফেলে তবে আমি নিরাপদ। আমার সমস্ত রাগ যেন গাড়োয়ানটার শরীরে চলে যাচ্ছিল। দেখছিলাম লোকটাকে যেন দানোয় পেয়েছে। ও গাড়িটায় আরেকটা জোর ধাক্কা লাগালো। তারপর ঘোড়াটাকে লোহার রডটা দিয়ে মাথায় মারতে শুরু করে দিলে। প্রথম বাড়ি পড়বার সময়েই আমি চোখ বুঁজলাম। চোখ খুলে দেখি ঘোডাটা হাঁটু মুড়ে আছে, এদিকে লোকটা মেরেই চলেছে। এই বেধড়ক মার ঘোড়াটাকে তোলবার জন্যে আর মোটেই নয়, একেবারে নিকেশ করে দেবার মার। এক পাশে হেলে পড়ল ঘোড়াটা, দুর্বল ভঙ্গিতে শূন্যে পা দুটো ছুঁড়লো, শেষে মাথাটা গুঁজলো কাদার মধ্যে। গাড়োয়ানটার মুখ তখন বিকৃত—রডটা এক ধারে ছুঁড়ে ফেললে। ঘোড়াটাকে এবার কেমন দুর্বলভাবে একটা নাড়া দিলো। বুঝলো ঘোড়াটাকে সে মেরে ফেলেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে লোকটার গা বাঁচিয়ে আলগোছে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি একটা রোমগামী ট্রাম। এক লাফে উঠে পড়লাম। পেছন ফিরে শেষবারের মত চোখে পড়ল মে মাসের ভেজা পাতার ফাঁকে সরাইখানার সাইনবোর্ডটা ঃ 'অস্তেরিয় দ্য ক্যচ্চি-য়াতোরি—মালিক ঃ আন্তনিও তোচ্চি।'

□ তপ্তদিনের তামাশা □

গরমকাল এলেই আমার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। হয়ত এখনও বয়েসটা নেহাৎ কাঁচা এবং স্বামীর দায়িত্ববোধটা মনে পাকা হয়নি তাই। গরমকালে ধনীলোকের বাড়ীর জানলা বন্ধ হয়ে যায় সকাল বেলায়। রাত্তিরে স্নিগ্ধ হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে আধো আলো আধো অন্ধকার ভরা বড় বড় ঘরগুলোতে। ঘরের আয়না, মার্বেল পাথরের মেঝে, মোমমস্থণ আসবাব ওই অল্প আলোয় জ্বলে ওঠে। ঘরের সব কিছু মনে হয় সাজানো-গোছানো ঝকঝকে তকতকে। এবং এক স্থির স্নিগ্ধ নির্জন নৈঃশব্দ বিরাজ করে। তেষ্টা পেলে ট্রের ওপর কাঁচের গেলাসে উপাদেয় ঠাণ্ডা পানীয় অরেন্জ লিমনেড চলে আসে। সেই কাঁচের গেলাসের পানীয় নাড়তে নাড়তে কানে আসে বরফ কুচির রিনরিনে শব্দ শুনতে নেহাৎ মন্দ লাগে না, কি বলেন ? কিন্তু গরীব চেহারার বাড়ীর হাল-চাল বেবাক আলাদা। গরমের দিন এলেই প্রাণ আইঢাই। ছোট্ট ঘিন্‌জি ঘরে গুমোট গরম যেন বাসা বাঁধে। তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু রান্নাঘরের কল থেকে যে গরম জল বেরুচ্ছে তা জল তো নয় যেন স্যুপ্। ঘরের ভিতরে হাঁটাচলা দায়। জিনিসপত্তরে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি। যেন ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। শার্ট পরা সবার। কিন্তু ঘামে শার্ট জবজব করছে, ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। জানালা বন্ধ করলে তিষ্ঠোনো দায়। কেননা রাত্তিরের হাওয়া ঐ সব ঘরে ঢুকতে পায়নি, অথচ ছ'-ছ' জন মানুষ সেখানে শোয় আবার জানালা যে খুলবেন তারও জো নেই। কড়া রোদ্দুরে মনে হবে রাস্তার উপরই বুঝি বসে আছেন। সব কিছু তেতে পুড়ে তপ্ত ধাতু যেন শুধু স্বেদ আর ধুলোর গন্ধ বয়ে আনে। গরমে লোকের মেজাজও যেন গরম হয়ে যায়। তারা ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। ধনী লোক ইচ্ছে হলে তিন-চারখানা ঘর পেরিয়ে বাড়ীর অন্য ধারে চলে যায়। গরীবের সে উপায় নেই। সার্ডিন মাছের মত গাদাগাদি হয়ে থাকতে হয় তেলচিটে নোংরা বাসন কোসনের মাঝখানে। আর তা নয়ত বেরিয়ে পড়তে হয় ঘর ছেড়ে।

এমনি এক গরমের দিনে গোটা পরিবারের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ঝগড়া হলো স্ত্রীর সঙ্গে, কেননা স্যুপ্‌টা নুনকাটা আর অসম্ভব রকম গরম !

শ্যালকের সঙ্গে হল, কারণ সে আমার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে মতামত দিলে। অথচ সে হক তার ছিল না। কেননা সে তখন বেকার অবস্থায় আমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে। ঝগড়া হল ভাই-বউর সঙ্গেও। কেননা সে আমার দিক টেনে কথা কইতে লাগলো। আর যেহেতু আমি জানতুম আমার পীরিতে পড়ে ছেনালি করছে সে, তাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলুম। মার সঙ্গে এক চোট হয়ে গেল, কারণ মা আমাকে থামাতে চেষ্টা করলেন। বাবার সঙ্গে হল, যেহেতু বাবা বললেন তিনি একটু শান্তিতে খেতে চান। এমনকি ছোট্ট মেয়েটার উপরও চোটপাট করলাম, কারণ ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। এরপর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে শুধু বললাম: "শুনে রাখো, আমি তোমাদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। অতএব চললুম, অক্টোবরে ঠাণ্ডার দিন আসার আগে আর আসছি নে।" ঘর ছেড়ে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে এলাম। বেচারি স্ত্রী পিছু পিছু দৌড়ে এল। আলসের উপর ভর দিয়ে ডেকে বললে শশার স্যালাডটা খেয়ে যেতে। শশার স্যালাড আমার খুবই প্রিয়। তাকে বললুম ওটা যেন সে নিজেই খেয়ে নেয়। বলে রাস্তায় নেমে এলুম।

আমরা বাস করি ভিয়া অস্তিয়েনস বলে একটা জায়গায়। রাস্তাটা পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন এসে হাজির হলাম লোহার পুলের কাছে—যার কাছেই রোমের নদী-তীরবর্তী বন্দর। বেলা তখন দুটো বাজে। দিনের মধ্যে সেই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশী গরম। আকাশটা দেখাচ্ছিল একটা চোট্-পাওয়া চোখের মত বিবর্ণ। পুলের কাছে পৌঁছে কাঁটাওলা রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালাম। গরমে যেন পুড়ে যাচ্ছিল। বিরাট ঢালু দেয়ালের তলায় দুটো জাহাজঘাটার মাঝখানে টাইবারকে দেখাচ্ছিল একটা খোলা ড্রেনের মত। সেই রকম ঘোলাটে রং। গ্যাসোমিটার দেখাচ্ছিল উড়ে যাওয়ার পর বাড়ীর চেহারার মতই। গ্যাস কারখানার ফারনেস, খামার বাড়ীর চুড়ো, পেট্রোল ট্যাংকের পাইপ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছুঁচলো ছাদ, এরা সব মিলে দিগন্তকে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছিল যে বোঝবার জো ছিল না জায়গাটা রোম নগরী নাকি উত্তরের কোনও শিল্প-শহর। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম টাইবারের দিকে। ছোট্ট হলদে টাইবার। তার বুকের উপর সিমেণ্টের বস্তা ভর্তি একটা বজরা জাহাজঘাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যখন ভাবলাম যে এই ছোট্ট নদীটাই নিজেকে বন্দর

বলে দাবী করে তখন না হেসে পারলাম না। অনেকটা ঠিক জেনোয়া ও নেপলস বন্দরের মত। ছোট বড় নানান আকারের জাহাজে ঠাসাঠাসি। এই খুদে বন্দরটা ছেড়ে পালাবার সত্যি সত্যি ইচ্ছে থাকলে আমি কিউমিসিনোতে চলে যেতে পারতাম। সেখানে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে দেখতে দিব্যি ভাজা মাছ খাওয়া যেত। শেষকালে আবার আমি চলতে শুরু করলাম। পুল পেরিয়ে নদীর দূর প্রান্তে প্রসারিত খোলা জায়গার দিকে এগোতে লাগলাম। যদিও জায়গাটার কাছাকাছি আমি থাকি, কিন্তু কোনদিন ঐ দিকটায় যাওয়া হয় নি। কোন্ দিকে যাচ্ছি না বুঝেই চলছিলাম। প্রথমে রাস্তা ধরেই হাঁটছিলাম। ধুলোবালি মাখা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলেও আসলে রাস্তাটা ছিল অ্যাস্ফল্টেরই। এর পরে রাস্তাটা কাঁচা সড়কের দিকে বাঁক নিলে, আর ধুলোবালি হয়ে উঠল পর্বত প্রমান। টের পেলাম যেখানে এসে পড়েছি সেটা রোম শহরের যাবতীয় জঞ্জাল ফেলার জায়গা। এক কুচি ঘাসও সেখানে নেই। বাজে কাগজ, জংধরা টিন, কপির ডাট ইত্যাকার আবর্জনা ছাড়া কিছুই নেই। আর এসবও নজরে পড়ল চোখ-ঝলসানো আলো আর তীব্র কটু গন্ধের মধ্য দিয়ে। আমিও মহা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আর এগোই তেমন ইচ্ছেও নেই, আবার ফিরতেও পারছি নে। হঠাৎ কানে এল কে যেন "স্·· স্···" করে একটা আওয়াজ করছে। কুকুরকে যেমন করে লোকে ডাকে অনেকটা তেমনি।

ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু না, কুকুরের কোন পাত্তাই নেই। তবে ঐ আবর্জনার পাহাড়েই কিন্তু ছাড়া কুকুরের দেখা পাওয়ার কথা। তখন মনে হল কেউ তবে আমাকেই ডাকছে। যে দিক থেকে ডাকটা আসছিল সেদিকে ফিরলাম। এতক্ষণ নজর করিনি, এখন নজরে পড়ল, জঞ্জাল স্তূপের পেছনে করোগেটেড্ লোহার ছাদওলা অতি ছোট বাঁকাচোরা একটা ঘর। বছর আটেকের ছোট্ট একটা মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ইঙ্গিতে ঘরে ঢুকতে বলছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম শাদাটে নোংরা মুখ, চোখের তলায় বয়স্ক মেয়েদের মত লালচে দাগ। পালক-টালক ও ধুলো মাখা ওর চুলগুলো ফুলে ফেঁপে দেখাচ্ছে একটা ঘুড়ির মত। মেয়েটার বেশবাস খুবই সাদামাটা-একটা ক্যানভাসের বস্তায় চারটে ফুটো করা। দুটো ফুটোয় দু হাত আর বাকী দুটোয় দু পা। ঘুরে দাঁড়াতেই মেয়েটা শুধোলো: "আপনি কি ডাক্তার"? বললাম: "নাতো। কেন, তোমার কি ডাক্তার চাই?" মেয়েটা বল্লে: "ডাক্তার হলে একবারটি ভিতরে

আসুন। আমার মার বড্ড অসুখ।"

আর কথা না বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে মনে যেন ক্যাম্পো দেই ফিয়োরি-র কোন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কাপড়ের দোকানে ঢুকেছি। কাপড়-চোপড়, জুতো-মোজা, বাসনপত্র। কোন আসবাব নেই বলেই পেরেকে ওসব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঝুলন্ত জিনিসগুলো থেকে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতে যখন এদিক ওদিক খুঁজছি কোথায় মেয়েটায় মা, মেয়েটা তখন আমাকে কেমন ধূর্ত ভঙ্গিতে কোনের একটা ছেঁড়া জামা কাপড়ের স্তুপের দিকে দেখিয়ে দিলে। কাছে এসে ভাল করে দেখে টের পেলাম ঐ স্তুপের থেকে একটা চোখ জ্বলজ্বল করে আমার দিকে চেয়ে আছে। অন্য চোখটা একগোছা চুল ঢাকা। স্ত্রীলোকটির চেহারা দেখে একটু অবাক হলাম। দেখতে বুড়োটে হলেও বোঝা যায় আসলে সে তরুণী। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল: "ফের তবে আমাদের দেখা হলো···।"

বাচ্চা মেয়েটা হাসিতে ফেটে পড়ল। যেন এবার এক ভারী মজার ব্যাপার শুরু হবে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে খালি টিনের বাক্স নিয়ে খেলতে লাগল। "কিন্তু আমি যে আপনাকে আদৌ চিনি না," আমি বললাম, "ব্যাপারটা কী বলুন তো,···এই বাচ্চা মেয়েটি কি আপনার মেয়ে" ?

"আলবৎ আমার মেয়ে," স্ত্রীলোকটি বলল, "আর তোমারও"।

মাথাটা নামিয়ে ফের মেয়েটা নিজের মনেই হাসল। ভাবলাম আসলে ব্যাপারটা বোধ হয় একটা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। জবাবে বললাম, "হয়ত আমারই মেয়ে। আবার অন্য লোকেরাও ত হতে পারে।"

"না পারে না।" মেঝে থেকে আদ্ধেকটা উঠে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "ও তোমারই মেয়ে, আর কারও নয়—অলস অপদার্থ কাপুরুষ কোথাকার।"

এসব গালাগালি শুনে মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ল। যেন এসব শোনার জন্যে ও তৈরী হয়েই ছিল। আমি ব্যাজার হয়ে বললাম: "দ্যাখো সমঝে কথা বলো। বলেছি ত, আমি তোমাকে মোটেই চিনি না।"

"চেনোনা, তাই না? তুমি আমাকে চেনোনা, অথচ দ্যাখো, ঠিক চলে এসেছো কিন্তু এখানে। যদি চেনোই না তবে এখানে আসার পথ চিনলে কি করে?"

"কাপুরুষ কোথাকার," বাচ্চা মেয়েটা নিচু গলায় আওড়াতে লাগল। আমি

তখন ঘামাতে শুরু করেছি-গরমেও বটে, অস্বস্তিতেও। বললাম : "এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম বইত নয়।"

"তাই বটে ওরে হতভাগী, ব্যাগটা দে তোরে আমাকে," মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললে। মেয়েটা চকিতে সিলিংয়ে ঝোলানো একটা কালো রঙা ভাঙাচোরা মলিন ভেলভেটের ব্যাগ নামিয়ে এনে দিলে ব্যাগটা খুলে সে এক পাতা কাগজ বার করে বললে,"এই দ্যাখো বিয়ের সার্টিফিকেট···এলভিরা প্রয়েত্তি ও আরনেস্তো র‍্যাপেল্লি···এখনও অস্বীকার করবে, আরনেস্তো র‍্যাপেল্লি ?

একটা ব্যাপারে অবিশ্যি আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। সত্যিই আমার নাম আরনেস্তো। থতমত খেয়ে বললাম : "কিন্তু আমি তো র‍্যাপেল্লি নই।"

"নন বুঝি ?" বাচ্চা মেয়েটা গুনগুন করতে লাগল, "আরনেস্তো, আরনেস্তো।" স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়াল। দেখলাম আমার অনুমান ঠিকই। চুল পেকে গেলে কি হয়, আর একটাও দাঁত যদিও নেই, তবু ওর বয়েস বছর তিরিশের বেশী কিছুতেই নয়। "তুমি তাহলে র‍্যাপেল্লি নও ?" পাছার উপর হাত রেখে সে আমার কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখে চেঁচিয়ে উঠল : "আলবৎ তুমি র‍্যাপেল্লি। দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি নিশ্চয়ই র‍্যাপেল্লি।"

বললাম : "এবার বুঝেছি, তোমার মাথার ঠিক নেই। কিছু মনে করো না, আমি চললুম।"

"একটু দাঁড়ান·· অত তাড়াহুড়ো করবেন না।" ইতিমধ্যে কখন মেয়েটা আমাদের চার পাশে ঘুরে ঘুরে মহা আনন্দে নাচ জুড়ে দিয়েছে। স্ত্রীলোকটি বিদ্রুপের সুরে ফের শুরু করলে : "আরনেস্তো, মহাশয় লোক আরনেস্তো·· যে কিনা তার স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে বছর খানিক বেপাত্তা হয়ে রইল··খবর রাখো কি এই এক বছর কিভাবে আমাদের এই দুটি প্রাণীর দিন কেটেছে ?"

রুক্ষ গলায় বললাম : "জানি না জানতে চাই না। যেতে দাও আমাকে।"

"ওরে তুই বল্," সে কেঁদে মেয়েকে বললে, "তুই বল তোর বাপকে, কি ভাবে দিন কেটেছে আমাদের।" আমার কাছাকাছি আসতে আসতে মেয়েটা রিনরিনে খুশি খুশি গলায় বললে, "লোকের দয়ার ওপর।"

স্বীকার করা ভাল, আমি রীতিমত ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। এতসব মিল— আরনেস্তো নাম, আমিও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, আমারও স্ত্রী আর কন্যা

আছে—আমায় মনে তখন এক অদ্ভুত অবস্থা। মনে হল আমি যেন আমি নই। কিংবা অন্য কোন রূপে কোন দিন ছিলাম না। এদিকে আমাকে ইতস্তত করতে দেখে স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার নাকের ডগায় এসে চেঁচিয়ে উঠল: "যারা তাদের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায় তাদের কি হয় জানো? জেল হয় তাদের···বুঝলে বদমাস? জেল হয়···"

এবার আমার রীতিমত ভয়-ভয় করতে লাগল। আর কথা না বাড়িয়ে দরজায় দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু দরজার দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে একজন আমাদের দিকেই তাকিয়েছিল। ছোটখাট একহারা গড়নের একটি স্ত্রীলোক। গরীব। কিন্তু বেশভূষায় পরিপাটি। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখে সে আমায় বললে: "ওর কথা কানে নেবেন না। যাকে দ্যাখে তাকেই ওর স্বামী বলে মনে করে ও। আর ঐ বাঁদর মেয়েটা ইচ্ছে করে লোককে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে নিয়ে আসে ওর মায়ের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে মজা পাবার জন্যে। দাঁড়া তোর শয়তানি বার করছি হতচ্ছাড়ি।" এই বলে মেয়েটাকে মারবার জন্যে সে হাত তুলতেই মেয়েটা চকিতে সরে গেল। আমার চার পাশে নাচতে নাচতে মহানন্দে আওড়াতে লাগল: "বিশ্বাস করেছিলেন আপনি, বিশ্বাস করেছিলেন। "ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আপনি, ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।"

ছিপছিপে চেহারার ঐ স্ত্রীলোকটি শান্তস্বরে বললে: "এ তোমার স্বামী নয়, এলভিরা।" কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে গেল। এক কোণে গোঁজ হয়ে বসে রইল। অন্য স্ত্রীলোকটি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরের পেছন দিকটায় গিয়ে রান্নার ষ্টোভটা খোঁচাতে খোঁচাতে বলতে লাগল: "আমি ওকে যা হক কিছু খাওয়াই। এটা সত্যি কথাই ওরা অন্য লোকের দয়ার উপর বেঁচে আছে। কিন্তু ওর স্বামী পালিয়ে যায় নি, মারা গেছে···"

আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। পকেট থেকে একশ লায়ার বার করে বাচ্চা মেয়েটার হাতে দিলাম। ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত না জানিয়ে সে টাকাটা নিয়ে নিলে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ফিরে চললাম যে পথ ধরে এসেছি সেই পথ দিয়ে সরু গলি পথ ধরে। অ্যাসফল্টের রাস্তায় এলাম। পুল পেরিয়ে চলে এলাম ভিয়া আস্তিয়েনসে। ঐ গরমে কুঁড়েঘরটা থেকে নিজের ঘরে এসে মনে হল যেন স্নিগ্ধ শান্তিতে ফিরে এলাম। আমার ঘরে সামান্য দু'চারখানা যে আসবাব আছে তা যত সাদামাটাই হোক ঐ হুকের চাইতে তো

ডাল, যে হুকে মা-মেয়ে ওদের ছেঁড়া জামা-কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছে। সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রী আমার জন্যে শশার যে স্যালাডটা সরিয়ে রেখেছিল সেটা বার করে দিলে। রুটি দিয়ে সেটা খেয়ে নিলাম। খেতে খেতে দেখছিলাম আমার স্ত্রী প্লেট ছুরি চামচ ধুচ্ছে। উঠে চুপিচুপি পেছন থেকে স্ত্রীর গলার ওপর একটা চুমু এঁকে দিলাম। ভাব হয়ে গেল আমাদের।

এর কিছু দিন বাদে আমার স্ত্রীকে ঐ কুঁড়েঘরটার কথা বলি। মনে মনে ঠিক করি আবার একবার ওখানে যাব, দেখব যদি বাচ্চা মেয়েটার কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমাকে আরনেস্তো র‍্যাপেল্লি বলে ভুল করবে এ ভয় আর এবার ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কি? ওখানে গিয়ে দেখি না কুঁড়েঘর না সেই স্ত্রীলোকটি, বা সেই বাচ্চা মেয়েটা, এমন কি যে ছিপছিপে স্ত্রীলোকটি ওদের রান্না করছিল কারোরই কোন চিহ্ন নেই। ঘণ্টা খানেক কাঠফাটা রোদ্দুরে স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু না, কোন সন্ধান মিলল না। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। আমার ধারনা নিশ্চয়ই আমি রাস্তা ভুল করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারনা আগাগোড়া ব্যাপারটাই আমার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই কল্পনায় আমার মনে যে অনুতাপের ভাব জন্মেছিল তার ফলেই নাকি সৃষ্টি করেছি এই কল্পিত কাহিনী।

□ মিলোনে □

সেই শীতকালটায় সবরকমের কাজেই হাত পাকিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে রেস্তোর"ায় রেস্তোর"ায় গীটার বাজিয়ে বেড়াতে লাগলাম। সঙ্গী ছিল এক বন্ধু —সে গান ধরতো আর আমি বাজাতাম। বন্ধুটির নাম মিলোনে। তাকে "প্রফেসর" বলেও লোকে ডাকত। কেননা এক সময় সে সুইডিশ জিমন্যাষ্টিক শেখাত। বয়েস ওর বছর পঞ্চাশেক হবে। মোটাসোটা চেহারাটা ঠিক স্থূলকায় বলা চলে না, বরং ওই মাংসল চেহারায় বেশ একটা আঁটোসাঁটো ব"াধুনিই ছিল। ওর ওই ভারী মুখটায় একটা ভয়ংকর ভাব ফুটে উঠতো। বিশাল বপু নিয়ে যখন ও চেয়ারে বসত তখন চেয়ার কঁকিয়ে উঠতো। আমি গীটার বাজাতাম সহজ সাধারণভাবে। নিবিষ্টমনে, না নড়েচড়ে, চোখ নাকিয়ে বাজাতাম। আমি হলাম গিয়ে শিল্পী, ভাঁড় তো নই। মিলোনেটা ভাঁড়ামো করতো। শুরু অবশ্য করতো সাধারণভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে, চোখের উপর পুরনো টুপিটা নামিয়ে, ভু"ড়িখানা বাগিয়ে যখন সে গান ধরতো তখন মনে হোত বুঝি কোন মাতাল চাঁদকে গান শোনাচ্ছে। ধীরে ধীরে মিলোনে জেগে উঠতো। কিন্তু গান গাইবার তার না ছিল গলা, না ছিল কান। তাই গান শেষ করতো সে নিছক ভাঁড়ামো করে। মিলোনের বৈশিষ্ট্য হোল সে ভাবপ্রবণ সঙ্গীত গাইত। গাইবার জন্যে বিখ্যাত গানগুলো বেছে নিত। যে গান শুনে সাধারণভাবে লোকের চোখে জল এসে পড়ার কথা, ওর মুখে সেই গানই হাসির খোরাক জোগাতো। ও জানতো কেমন করে ভাবের জিনিসকে হাসির জিনিস করে তোলা যায়। যৌবনে কোন নারীর কাঁকণ-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, নাকি স্বভাবই ওর অমনধারা ঠিক্ বুঝে উঠতে পারতাম না। কিন্তু সে শুধু একটা টাইপ চরিত্র মাত্র ছিল বল্লে ঠিক বলা হয় না। ওর ভঙ্গীতে একটা উদ্দামতা প্রকাশ পেত। যারা ওখানে আসতো তারা খানাপিনা নিয়ে এত মশগুল থাকত যে ওর ভাবভঙ্গি ভালো করে বোঝার মন ওদের থাকত না। তারা বুঝতো না হাসির আড়ালে ওর কান্না লুকিয়ে থাকতো। মেয়েলি ধরণধারণ হাবভাবভঙ্গি যখন ও নকল করে দেখাতো তখনই ওর যত কেরামতি। মেয়েছেলে ছেনালির ঢঙে হাসে কি? টুপির তলা থেকে বেশ্যার নির্লজ্জ হাসি

হেসে দেখাতো সে। পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে কি ওরা? মিহি মোলায়েম গলায় কথা কয়? ঠোঁট কুঁচকে গলা দিয়ে বাঁশীর মত এমন সরু সুরেলা আওয়াজ বার করতো যা শুনে গা গুলিয়ে উঠতো। আসলে রয়ে-সয়ে কিছু করা ওর ধাতে ছিল না। সব তাতে বাড়াবাড়ি করা চাই। আর তাই গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত অসহ্য ভাঁড়ামো। সময় সময় এতদূর বাড়াবাড়ি করতে যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত। গীটারের গায়কের সঙ্গত করা এক কথা, আর ভাঁড়ামোর সাকরেদী করা আলাদা ব্যাপার। কেবলি মনে পড়ত যেসব গান অমন ভাঁড়ামো করে ও গায়, সেগুলো এই কিছুদিন আগেও গুণী গাইয়ের সঙ্গে গীটারে সঙ্গত করে এসেছি। গানগুলোর এই লাঞ্ছনায় মনে মনে খুবই দুঃখ পেতাম। একবার কথাটা পেড়েই ফেললাম। বললাম: "আচ্ছা, মেয়েরা তোমার কোন্ ক্ষতিটা করেছে শুনি?" বলল: "ক্ষতি? না তো, কোন ক্ষতিই করেনি।" বললাম: "তবে মেয়েদের নিয়ে তুমি এত ঠাট্টা তামাশা করো কেন?" কথাটা শুনে সে চুপ মেরে গেল। আমিও চুপ করে গেলাম।

ওকে ছেড়ে কবেই চলে আসতাম, থেকেছি কেবল ওর সঙ্গে থেকে দুটো পয়সা পকেটে আসছিল তাই। মজা হল, ওই ইতরামি দিয়ে অনেক ভালো গাইয়ের চেয়েও বেশী রোজগার করত। খুব যে নামী রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতাম তা নয়। সাধারণ রেস্তরাঁতেই যাতায়াত ছিল বেশী। এখানে লোকেরা আসতো পেট পুরে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা আমোদ কুড়োতে। আমরা হাজির হওয়ামাত্র সমবেত স্বরে একটাই ধ্বনি হত: 'ঐ যে, প্রফেসর এসে গেছে। এসো হে প্রফেসর, এদিকে এসো।' ভারিক্কি ভঙ্গীতে একটু নীচু হয়ে মিলোনে বলত: "আপনাদের সেবায় হাজির।" এই 'আপনাদের সেবায়' হাজির কথাটাই এমন ঢঙে বলত যে লোকে হেসে কুটিপাটি হত। এদিকে টেবিলে টেবিলে খাবার পৌঁছে দিতে ওয়েটাররা ব্যস্ত হয়ে পড়ত। আর মিলোনেও এমনি সময় কিরকম বোকা বোকা গলায় বলে উঠত: 'শুনুন একটা সত্যিকার সুন্দর গান:' 'রেজিনা যখন গ্রাম থেকে এলো'। 'আমি হবো রেজিনা।' দৃশ্যটা কল্পনা করুন। ওই লোকগুলো খাবার মুখে তুলতে তুলতে হাঁ করে ওর রেজিনা সেজে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দুচোখ দিয়ে গিলছে। অথচ লোকগুলো আদৌ ইতর শ্রেণীর নয়, রীতিমতো সভ্যভব্য লোক। কেতা দুরস্ত পুরুষ আর দামী গয়না-পরা

মহিলারা সব। মিলোনের ভাঁড়ামো দেখে ওরা বলাবলি করত :” “সত্যি ওর তুলনা হয় না। ও অসাধারণ।” মিলোনের হাজারো রকমের অসভ্যতার একটা ছিল মুখ দিয়ে এক ধরনের আওয়াজ বার করা। এতে রগড় বাড়ত আরো। আর বিশ্বাস করবেন কি, ওই সব রুচিশীলা সুন্দরী মহিলারাই মিলোনেকে ওই গান ফের ধরবার জন্য সাধাসাধি করত।

এতো প্রশংসা পেয়ে পেয়ে মিলোনের মাথা যে ঘুরে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ভিয়া সিমারায় একটা অন্ধকার ভ্যাপসা ঘরে থাকত মিলোনে। যতবারই ওখানে গেছি, দেখেছি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নতুন কোনও ইতর ভঙ্গি তৈরীর কাজে সে ব্যস্ত। এত মন দিয়ে এ কাজ করত যে মনে হত যেন কোন বড়ো অভিনেতা অভিনয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছে। ওর এসব কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হত নিশ্চয়ই ওর মাথায় একটু ছিট আছে। একদিন বললাম : ‘আচ্ছা মিলোনে, এবার এমন কিছু একটা বার করতে পারো না যা সুন্দর, যা লোকের মনের গভীরে গিয়ে পৌছায় ?’ জবাবে সে বলেছিল : “দ্যাখো, এসবের তুমি কিস্যু বোঝো না। লোকে খেতে খেতে হাসতে চায়, গভীর কিছু চায় না। আর আমি ওদের হাসির যোগান দিই।” কেমন করে আরো নতুন চমক দেওয়া যায় এই ভেবে একদিন সে মেয়েদের ছোট টুপি, স্কার্ফ, পেটিকোট এধরনের কিছু সাজপোশাক সুটকেসে পুরে চলাফেরা শুরু করে দিল। ওর ধারণা এ দিয়ে লোককে আরো বেশি হাসানো যাবে। এইভাবে মেয়ে-সাজা ওকে যেন নেশার মত পেয়ে বসল। অথচ ওর এসব ভাঁড়ামো যে কী মর্মান্তিক মনে হত আমার, বোঝাতে পারব না। শেষকালে নতুন কিছু আর না পেয়ে আমাকেও ও ভাঁড় সাজতে বলল। আমি সোজা অস্বীকার করলাম।

নানান রেস্তরাঁ আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে আর রাত আটটা থেকে বারোটা অবধি ঘুরতাম। কোন এলাকায় কবে যাব ঠিক করা থাকত। বিশেষ কথাবার্তা হত না। আমাদের মধ্যে, অন্তরঙ্গও ছিল না। একটা দিনের পালা ফুরোলে কোনও মদের দোকানে ঢুকে টাকাটা ভাগাভাগি করে নিতাম। আমি নীরবে সিগারেট ধরাতাম আর মিলোনে মদ নিয়ে বসত। বিকেলের দিকে মিলোনে যথারীতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রকমারি ভঙ্গির চর্চা করত আর আমি হয় পড়ে পড়ে ঘুমোতাম নয়তো সিনেমায় যেতাম।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া বইছিল। আমরা ত্রাস্তভিয়ার

রেস্তরাঁগুলো ঘুরে টুরে পিয়াজ্জো মাস্তাইর পেছন দিকের এক মদের দোকানে ঢুকে পড়লাম। ঠিক গানবাজনার উদ্দেশ্যে নয় একটু চাঙ্গা হয়ে নেবার জন্য। দেখলাম সরু লম্বা ঘরে দেয়ালের গায়ে পর পর টেবিল সাজানো। খদ্দের বেশীর ভাগ গরীব-গরবা লোক। ওই রকম একটা মদের দোকানে মিলোনের গাইবার কথা নয়। সবিস্ময়ে দেখলাম মিলোনে গাইছে। অবিশ্যি এটা যে তার নিছক খামখেয়াল ছাড়া কিছু নয় সেটা বুঝতে কষ্ট হলনা। যাই হোক, খুব ভালো একটা গান সে ধরলো এবং যথারীতি সেটাকে রঙ্গেব্যঙ্গে ধরাশায়ী করে ছাড়লো। গান শেষ হতে যৎসামান্য হাততালির আওয়াজ শোনা গেল। একটা টেবিল থেকে কে একজন বলে উঠল: "এবার শুনুন, গানটা আমি গেয়ে শোনাই।"

ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল পরম রূপবান একটি যুবক এগিয়ে আসছে। এমন কটমট করে মিলোনের দিকে তাকাচ্ছে যেন পেলে এক্ষুণি চিবিয়ে খায়। "ধরুন," যুবকটি আদেশের সুরে আমায় বললে, "গোড়া থেকে শুরু করুন।" মিলোনে ব্যাপার দেখে বেশী ঘাবড়ে গেছে বোঝা গেল। ক্লান্ত হবার ভান করে দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমাকে বাজনা শুরু করতে বলে যুবকটি গাইতে শুরু করল। খুব ভালো গাইছিল এমন নয়। গাইছিল দরদ দিয়ে প্রাণ ঢেলে, বেশ মিষ্টি আমেজি গলা। আর এ ধরনের গান এমন দরদী গলায়ই তো গাইতে হয়। তাছাড়া ওর ওই অসম্ভব সুন্দর চেহারার কাছে মিলোনেকে আরো বেমানান বেঢপ দেখাচ্ছিল। ছেলেটা গাইতে গাইতে বার বার একটা মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিল। মনে হল ছেলেটা যেন ওর জন্যেই গাইছে। গান শেষ হলে মিলোনের দিকে সে এমন ভঙ্গি করে তাকালে যার মানে দাঁড়ায়: "বুঝলে হে, এ গান এভাবেই গাইতে হয়।" মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটির গলা সে জড়িয়ে ধরল। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম ওখানে আর কেউ কিন্তু ছেলেটার গানের বিশেষ তারিফ করল না। তবু মিলোনের গানের তারিফ করেছিল। কেন যে ছেলেটা গাইতে উঠল তাই যেন ওরা বুঝে উঠতে পারছেনা মনে হল। আমি কিন্তু বুঝলাম। বুঝেছিল মিলোনেও।

ছেলেটার সঙ্গে বাজাতে বাজাতে বার বার আমি মিলোনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলাম। কয়েকবারই দেখলাম ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ওর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু তা হলে কি হবে। ওর চোখে মুখে যে

আসলে একটা ভীষণ বিরক্তির ভাব ফুটে উঠছিল তা আমার নজর এড়াল না। এ জিনিস ওর মুখে এর আগে আর দেখিনি। আর যতবার নতুন নতুন পদ ধরছিল তত ওর বিরক্তি বাড়ছিল। শেষকালে মিলোনে উঠেই পড়ল। আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তোলার ভঙ্গি করে বলল: "এবার ওঠা যাক। আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে।"

রাস্তায় মোড়ের কাছে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পরদিন কোথায়-কোথায় যাওয়া হবে সেটাও যথারীতি ঠিক করে নিলাম। সেই রাতে এরপর কি-কি ঘটেছিল পরে আমি ভেবেছি। অবিশ্যি সবটাই আমার অনুমান মাত্র। আগেই বলেছি, প্রশংসা শুনে শুনে মিলোনের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। নিজেকে একটা শিল্পী বলে ভাবতে শুরু করেছিল। অথচ আসলে সে ছিল নিছক ভাঁড়, যার কাজ খাবার সময়ে লোককে কিছু আমোদ যোগানো। আর আর ঠিক ওই কারণেই যুবকটির গান শুনে সে অমন ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল। মনে হয় ছেলেটা যখন গাইছিল হয়ত তখন হঠাৎ মিলোনে নিজেকে চিনতে পেরেছিলে। বুঝতে পেরেছিল আসলে সে এক ধুমসো বুড়ো, যে কিনা বাচ্চা সেজে গানের সঙ্গে ছোটদের ছড়া আউড়ে যাচ্ছে। লোককে হাসানো ছড়া আউড়ে যাচ্ছে। লোককে হাসানো ছাড়া তার আর কোনও ক্ষমতাই নেই। তাছাড়া এমন কতগুলি জিনিসকে সে ঠাট্টা করে হাসাতো যা নিজের জীবনে হতে চেয়ে সে হতে পারেনি।

কিন্তু বলেছি ত, এ সবই আমার অনুমান মাত্র। যেটুকু অনুমান নয় তা হল, পরদিন বাড়িওলা দেখতে পেল যেখানে পাখির খাঁচা ঝুলত সেখানে মিলোনে ঝুলছে। ভিয়া সিমায়ার লোকেরা জানলার ভেতর দিয়ে শুধু শূন্যে ঝোলা ওর পা দুটো দেখতে পেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। আয়না লাগানো দেরাজ আলমারিটা দরজার গায়ে ঠেসান দেওয়া ছিল। গাইতে বেরনোর আগে যেমন করে আয়নায় হাবভাব দেখে নিত তেমনি করেই যেন গলায় দড়ি পড়ানোর মুহূর্তে আয়নায় সে ব্যাপারটা দেখে নিচ্ছিল। সে যাই হোক, দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকার সময় আয়নাটা পড়ে ভেঙে গেল। মিলোনের কবর দেবার সময় আমি ছাড়া আর কেউই ওর সঙ্গে ছিল। না এবার গীটার ছাড়াই ওর সঙ্গে চললাম। বাড়িউলি আয়নার শোক ভুলল মিলোনে যে দড়িটা গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সেটা অনেক পয়সায় বেচে দিয়ে।

□ আইডা □

বেশীরভাগ লোকই নিজের ওজন বোঝে না। কে যে তার চেয়ে উঁচুদরের কে যে নয় সে ধারনা নেই। এই আমি যেমন—ধরেই নিয়েছিলাম আমার মত হতভাগা আর দুটি নেই। এটা ঠিকই যে আমি ইস্পাতের ধাতুতে গড়া ছিলাম না, কিন্তু তাই বলে নিজেকে ঠুনকো কাঁচের মত ভাববারও কোন কারণ ছিল না। এতে করে নিজেকে নিজেই খেলো করে ফেলেছিলাম বইত নয়। মনে যখন-তখন নিজের গুণাবলীর একটা হিসেব কষতাম। শরীরে জোর বলতে তো কিস্যু নেই। ছোটখাট দড়ি পাকানো চেহারা আর কাঠি-কাঠি হাত পা নিয়ে অনেকটা মাকড়সার মত দেখতে আমাকে। বুদ্ধিশুদ্ধির বালাইও বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয়নি। তা নয়ত একটা হোটেলে ডিস্ ধোয়ার কাজে পচে মরছি কেন দিনের পর দিন। দেখতে শুনতে তো একেবারে যাচ্ছেতাই বলা যায়। হলদে রঙের চিম্‌সানো মুখ, ঘোলাটে চোখ আর ইয়া বড় একখানা নাক। আমার মুখের ডবল সাইজের মুখ হলে তবেই এই নাক মানায়। আর সোজা নামতে নামতে নাকের ডগাটা উঠে গেছে উপরের দিকে, যেন গিরগিটি নাকটা তুলে আছে এমনি মনে হয়। সাহস, চটপটে ভাব, যা দেখলে লোকের ভাল লাগে এসবের কথা না তোলাই ভাল। আর সব দেখেশুনে মেয়েদের ব্যাপারে আমি দূরে সরে সরেই থাকতাম। জীবনে একবার শুধু ওপথ মাড়িয়েছিলাম—হোটেলের একটা ঝিকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম। ও আমাকে একদম ঠাণ্ডা বানিয়ে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে আমার মনে হলো জগতে আমার দ্বারা কিছুই হবে না। চুপচাপ এক কোনে মাথা গুঁজে দিন কাটিয়ে দেয়াই এবং কোন ঝামেলায় না যাওয়াই আমার বিধিলিপি।

সন্ধেসন্ধি নাগাদ কেউ রোম হোটেলের (যেখানে আমি কাজ করি) পেছন দুয়ারী রাস্তা দিয়ে গেলেই দেখতে পাবে একতলায় একসার খোলা জানলা আর তাই দিয়ে ভেসে আসছে বাসন ধোওয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ। ওই নিরানন্দ পরিবেশে চোখ মেলে দেখলে দেখা যাবে যে কাঁড়ি-কাঁড়ি বাসন টেবিলের এবং

বাসন ধোয়ার জায়গায় ডাঁই করা আছে। আর ওই কোনটাই আমি বেছে নিয়েছিলাম সবার চোখের আড়ালে যাতে থাকতে পারি। কিন্তু অদৃষ্ট ব্যাপারটা কি অদ্ভুত দেখুন। ঘাসের বুক থেকে ফুলের মত কেউ আমাকে তুলে নিলে, একি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? অথচ রান্নাঘরের ওই কোনায় সেই অঘটনই ঘটলো। আইডা আমাকে লুফে নিলে গিউদ্দিওার জায়গায় আইডা এসেছিল নতুন বাসনমাঝা ঝি হিসেবে। বাচ্চা হবে বলে গিউদ্দিওা ছুটি নিয়েছিল। ছেলেদের মধ্যে আমি যেমন আইডা তাই মেয়েদের মধ্যে-নেহাৎ বেচারা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। আমার মতই ওরও ছোটখাট দড়ি পাকানো-চেহারা- মোটেই চোখে পড়বার মত নয়। তবে আইডা ছিল আবেগপ্রবণ চঞ্চল ফুর্তিবাজ মেয়ে। আমরা মুহূর্তেই বন্ধু হয়ে গেলাম। হব নাইবা কেন? একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ দুজনের। তারপর যা হয়। ও আমাকে এক রোববার সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতে বললো। নেহাৎ খাতিরে রাজি হয়ে গেলাম। অবাক হবার পালা তারপর। সিনেমা হলের অন্ধকারে ও আমার হাত তুলে নিলে, আঙুলে আঙুলে গেল জড়িয়ে। কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাতটা ছাডিয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু আইডা চুপিচুপি বললো- চুপ করে থাকতে, বললো হাতে হাত রাখলে এমন কি আশ্চর্যের কাজ হয়! হল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললো, কিছুদিন ধরেই ও আমাকে লক্ষ্য করে আসছে- বলতে গেলে হোটেলে আসার দিন থেকেই। তখন থেকে আমার কথাই রাতদিন ভাবছে। আর যেহেতু আমাকে ছাড়া ওর জীবনের কোন মানেই হয় না, আমিও হয়ত ওর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। আমার জীবনে এমন কথা কোন মেয়ের মুখে শোনা এই প্রথম, হোক না সেই মেয়ে আইডা। তাই মাথা ঘুরে গেল আমার। ও যা-যা জানতে চাইল সবই বলে গেলাম। এমন কি যা জানতে চায়নি তাও বলে ফেললাম।

আমি দারুণ অবাক হয়ে গেলাম। আইডা যদিও বলে চললো আমার প্রেমে ও পাগলিনী প্রায়, আমার কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এরপর যখনই দুজনে বেরতাম, আমি কথাটা পাড়তাম—আইডার মুখে সেই অবিশ্বাস্য কথাটা নতুন করে শোনার লোভে। বলতাম, "এবার বল তো, আমার মধ্যে তুমি কি এমন দেখলে যে আমাকে একেবারে ভালবেসে ফেললে?" বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা—আমার হাত ওর দুহাতে জড়িয়ে মুগ্ধ চোখে চেয়ে ও বলতো,

"তোমায় ভালবাসি কারণ তোমার সব গুণ আছে। আমার চোখে তুমি সবদিবে নিখুঁত।" সন্দেহের সুরে আমি বলতাম, "সব গুণ? এমন কথা আগে তে কখনো শুনিনি।" "হ্যাঁগো হ্যাঁ, সব সব। চেহারাই ধরোনা, কী সুন্দর তুমি দেখতে।" কথাটা শুনে আমি হেসেই ফেললাম। বললাম: "আমি সুন্দর দেখতে? আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখনি বোধহয়।...নিশ্চয়ই দেখেছি! সব সময়ই তো দেখছি।...তাহলে আমার নাকটাও দেখেছ আশাকরি... ঠিক এরকম নাকই আমার পছন্দ" বলেই আমার নাকটা দু আঙুলে ধরে ঘণ্ট বাজানোর ভঙ্গীতে বলতে লাগলো: "কী মিষ্টি নাক্। এমন নাকের জন্যে কী না করা যায়। তাছাড়া তোমার কী বুদ্ধি।" "আমার বুদ্ধি? তবে যে সবাই বলে আমার ঘটে বুদ্ধি নেই।" "ওটা হিংসের কথা, বুঝলে?" মেয়েলী যুক্তিতে ও বলে চললো, "তুমি শুধু বুদ্ধিমান নও, দারুণ বুদ্ধিমান। যখন কথা বলো আমি তো হ্যাঁ হয়ে শুনি। তোমার মত বুদ্ধিমান লোক জীবনে দেখিনি।" আমি তখন বলতাম: "বেশ তাই নয় হলো। কিন্তু গায়ে আমার খুব জোর আছে এমন কথা নিশ্চয়ই বলবেনা তুমি?" বেশ জোরের সঙ্গে ও জবাব দিত: "আলবৎ জোর আছে—ভীষণ জোর আছে তোমার।" শুনে ঢোঁক গিলতে হলো। চুপ করে রইলাম। আইডা ফের বলে চললো: "তাছাড়া তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা আমাকে টানে।" বলি: "সেই এমন কিছুটা কি?" "কী করে বোঝাই বলো?" ও বললো "ধরো তোমার গলার স্বর, তোমার ভাবভঙ্গী, তোমার চালচলন...এমন জিনিস আর কারও নেই।" বলাই বাহুল্য, কথাগুলো হজম করতে সময় লাগলো। তবে এসব কথা ওর মুখে বারবার শুনতে চাইতাম। কেননা নিজেকে এতদিন ধরে যা ভেবে এসেছি তার সঙ্গে আইডার কথা তুলনা করে বেশ মজাই লাগতো।

কবুল করতে বাধা নেই, ধীরে ধীরে আইডার কথা আমার মগজে বাসা বাঁধতে লাগলো। সত্যিও তো হতে পারে ওর কথা।—মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম। তার মানে এ-নয় যে আসলে নিজেকে যা ভেবে এসেছি এতকাল তার চেয়ে আলাদা কিছু ভাবছি। কিন্তু আইডার সেই "এমন কিছু একটা আছে" কথাটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারতাম না। মনে হোত, ওতেই রহস্যটা লুকনো আছে। কারণ এই এমন একটা কিছু দেখতে পায় বলেই না

মেয়েরা কখনো কখনো কুঁজো, বামনবীর, বুড়ো, এমনকি কিম্ভূতকিমাকার লোককেও পছন্দ করে। আর আমি তো এসবের কিছুই নই—তবে আমাকে কোন না কোন মেয়ে পছন্দ করবে নাই-বা কেন ?

প্রায় এইরকম সময়েই আইডা আর আমি ঠিক করলাম প্যাসেজিয়াটা আর্কিওলজিকার উল্টোদিকে যে সার্কাস এসেছে সেটা দেখতে যাব। দুজনেরই খুব ভাল লাগছিল। সার্কাসের তাঁবুর ভেতরে গিয়ে সস্তার সীটে দুজনে হাতে হাত রেখে গা ঘেঁসে বসলাম। আমার পাশে বসেছিল ফর্সা রঙের সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী এক তরুণী আর তার সঙ্গে ছিল লম্বা-চওড়া মজবুত চেহারার এক যুবক। ওদের দেখে মনে হল, যাকে বলে "সুন্দর জোড়ে মিলেছে।" তারপর ওদের কথা মনে রইলো না, সার্কাসের দিকে মন দিলাম। খেলা দেখাবার আসর তখনও খালি। দূরে দেখা যায় একটা মঞ্চের ওপরে লাল পোশাক পরা ব্যাণ্ডপার্টি দাঁড়িয়ে। পেতলের তৈরী বাঁশী ও নানা যন্ত্রে একটার পর একটা রণসঙ্গীত বেজেই চলেছে। শেষমেষ এলো চারটে ভাঁড়। দুটো ভাঁড় বামনবীর আর দুটো কিছুটা লম্বা। ওরা এসেই মহা খুনসুটি জুড়ে দিলে। একজন আর একজনকে ভাঁড়ামোতে পাল্লা দিয়ে চললো। এসব দেখেশুনে আইডা হাসতে হাসতে কাশতে শুরু করে দিলে। এমন সময় ব্যাণ্ডে বেজে উঠলো জমজমাটি বাজনা। এবার শুরু হল ঘোড়ার খেলা। ঘোড়াগুলো রিংয়ের চারধারে চক্কর দিয়ে চলল, আর চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেনারমশাইর লম্বা চাবুক হিস্‌হিসিয়ে উঠলো। রেশমী স্কার্ট ও সাদা টাইটস্ পরা একটি মেয়ে নাচতে নাচতে এলো। লাগাম ধরে একটা ঘোড়ার কখনও পাশাপাশি ছুটছে আবার কখনো নামছে। এদিকে ঘোড়াগুলো চক্কর দিয়েই চলেছে। ঘোড়ার খেলার পর ভাঁড়ের দল আবার ফিরে এলো। ডিগবাজি খেল, একে অন্যের পাছায় লাথি মারল এমনি সব তামাশা। এর পর এলো ট্র্যাপিজ খেলার পালা—একই পরিবারের বাবা, মা ও ছোট একটি ছেলের খেলা। তিনজনেরই পরনে নীল আঁটশাঁট পোশাক। তিনজনেরই ভাল স্বাস্থ্য, বিশেষ করে ছেলেটির।' হাত-তালি দিল ওরা। ওমা, তরতরিয়ে একটা দড়ি বেয়ে দেখতে দেখতে উঠে গেল তাঁবুর চূড়ায়। রিং ধরে ওরা ঠেলে দিল। রিং দুলতে লাগলো সামনে পেছনে, ওরা কখনও হাতে কখনো পায়ে ঝুলে রইল সেই রিংয়ে, আর বাচ্চা ছেলেটাকে একটা বলের মত নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিল। এসব

দেখে ত আমার চোখে পলক পড়ে না। আইডাকে বলি, "ছাখো ছাখো, কী আশ্চর্য। আমারও ইচ্ছে হয় শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি, পায়ে অমনি রিং জড়িয়ে ধরি।" আইডা যথারীতি আরও কাছে সরে এসে আতুরে গলায় বলল: "এসবই অভ্যেসের ব্যাপার···চেষ্টা করলে তুমিও অমনি পারো।" দেখলাম, ফর্সাপানা মেয়েটি আমাদের দিকে একবার তাকালো, তারপর ওর সঙ্গীকে ফিস-ফিসিয়ে কী যেন বলল, দেখলাম দুজনে হাসতে শুরু করেছে। রিংয়ের খেলা শেষ হবার পর এলো পয়লা নম্বরী আকর্ষণ—সিংহের খেলা। লালকুর্তা পরা এসে ট্রাপিজের খেলার জন্যে পাতা কার্পেটটা তুলে নিয়ে গেল। কিন্তু কার্পেটের মধ্যে থেকে গিয়েছিল একটি ভাঁড়, তার মুখটা শুধু বেরিয়েছিল। আর তাই দেখে আইডার সে কি হাসি—চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ে আর কি। যুবকেরা চটপট আলগোছে চত্বরের মাঝখানে এনে রাখল মস্ত একটা খাঁচা। বাজনা বেজে উঠলো। খাঁচার একটা ছোট্ট দোর দিয়ে সিংহের বিশাল মাথা বের হল। সবশুদ্ধ পাঁচটা সিংহ আর একটা সিংহী বেরিয়ে এলো খাঁচা থেকে। দেখেই বোঝা গেল, ওদের মেজাজ খিঁচড়ে আছে। বিকট গর্জন শুরু হয়ে গেল। সবশেষে এল সিংহের খেলা যে সেখাবে সে। সবুজ কোট পরা ছোট-খাট মানুষটি এসেই দর্শকদের অভিবাদন জানাতে শুরু করল। একহাতে চাবুক, অন্য হাতে আঁকশি লাগানো ছড়ি। সিংহরা গর্জন করতে করতে ওকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল। সে শান্ত ভঙ্গীতে হাসিমুখে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে চলল। শেষে সিংহের দিকে ফিরে আঁকশির খোঁচায় ওদের ছোট ছোট টুলের ওপরে ওঠাল। টুলগুলো খুবই ছোট সাইজের। ওতে বড়জোর বেড়াল বসতে পারে। তার ওপরে ওঠানো হল বেচারা সিংহগুলোকে। গুটিসুটি মেরে ওরা গর্জন তুলল, দাঁত বার করল। ওদের পাশ দিয়ে ট্রেনার মশাই যেতে গোটা দুতিন সিংহ থাবা বাড়াতেই সে আশ্চর্য কায়দায় সরে গেল। "লোকটাকে যদি খেয়ে ফেলে?" আমার হাত জড়িয়ে ধরে আইডা ফিসফিসিয়ে বলল। একসঙ্গে অনেকগুলি ড্রামের আওয়াজ। লোকটা সবচেয়ে বুড়ো সিংহটাকে বেছে নিয়ে নিজের মাথাটা সিংহের মুখে ঢুকিয়ে দিলে পরপর তিনবার। তুমুল হাততালি। আইডাকে বললাম: "বললে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না···ইচ্ছে করছে খাঁচায় ঢুকে আমিও অমনি সিংহের মুখে মাথা গলিয়ে দি।" আইডা আমার গা ঘেঁসে

মুগ্ধ গলায় বলল : "আমি জানি, ইচ্ছে করলেই তুমি তা পার।" একথা শুনে সুন্দরী মেয়েটি ও তার সঙ্গী আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসেই অস্থির। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না যে ওরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। আইডা রেগে গিয়ে আমার কানে কানে বলল : "ওরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে ...ওদের বল না এটা কোন্ ধরনের সভ্যতা?" ঠিক এমনি সময় একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। সবাই সীট ছেড়ে উঠে পড়ল। সিংহের খেলা শেষ। সিংহকুল মাথা হেঁট করে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। খেলার প্রথম পর্ব শেষ।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি ওরা দুজন আমাদেরই আগে আগে চলেছে। আইডা কানে কানে বলে চলল : "ওদের বল না যে ওরা অভদ্রের মত ব্যবহার করেছে...তোমাকে বলতেই হবে-আর না যদি বল তো বুঝবো তুমি একটা কাপুরুষ।" পৌরুষে ঘা লাগতেই স্থির করলাম, এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। বড় তাঁবুটার বাইরে ও তার ছায়ায় একটা ছাউনী দিয়ে সার্কাসের অংশ হিসেবে একটা চিড়িয়াখানা খোলা হয়েছিল। কিছু আলাদা পয়সা ধরে দিলেই দেখা যেত। একধারে কতগুলি খাঁচায় বন্যজন্তু আর একধারে খড়ের গাদায় জেব্রা, হাতি, ঘোড়া, কুকুর এসব পোষা জানোয়ার ছাড়া অবস্থায় ছিল। ছাউনীর ভেতরটায় আবছা অন্ধকার। কিন্তু তাতেই দেখতে পেলাম ওরা দুটিতে ভালুকের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। কিন্তু ভালুকটা গুটিসুটি মেরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। খাঁচার গরাদ দিয়ে ভালুকটার লোমশ শরীর শুধু দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরে টানছিল চলে আসার জন্যে। আমি সোজা গিয়ে শক্ত গলায় ছেলেটাকে বললাম : "তোমরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছিলে কেন?"

ছেলেটা একটু ঘুরে কোনরকম ইতস্তত না করেই বলল : "তা নয়। আমরা হাসছিলাম একটা দাঁড়কাক ময়ূর সাজছিল বলে।"

"দাঁড়কাকটা বোধ হয় আমি।"

"মনে করলে তাই।"

আইডা এদিকে পেছন থেকে সমানে খুঁচিয়ে যাচ্ছে। গলা চড়িয়ে বললাম : "আর তুমি কি জান? আস্ত একটা আহাম্মক।"

ছেলেটা বর্বরের মত বলে উঠল : "এ যে দেখি আবার ফণা তোলে—কোথায় যাব।"

কথা শুনে মেয়েটা হেসে উঠল। আহত ফনীনির মত আইডা হিস্‌হিসিয়ে উঠল :

"এতে হাসির কিছু নেই···না হেসে বরং আমার স্বামীর গায়ে গা ঘষা থামাও দিকিনি। ভেবেছ, কিছুই আমি দেখিনি? সারাটা সময় তুমি ওর গায়ে গা ঘষছিলে না?"

আইডার কথা শুনে তো আমি থ! তেমন কিছু সত্যি আমার নজরে পড়েনি। হতে পারে পাশে বসেছিল বলে মেয়েটার কনুইর ছোঁয়া হয়ত আমার গায়ে লেগেছে, তার বেশী কিছু নয়। মেয়েটি বেশ রেগেমেগে জবাব দিল : "তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে···?"

"মোটেই না। তুমি ওর গায়ে গা ঘষছিলে, আমি দেখেছি।"

"তোমার স্বামীর মত নেহাৎ গোবেচারা একটা লোকের আমার কি দরকার বলো?" মেয়েটা অসীম হেলা ভরে কথাটা বলল। "ঘষতেই যদি হয় তো সত্যিকারের একটা পুরুষ মানুষই বেছে নেব—আর এই গ্যাখো সেই পুরুষ" বলে মেয়েটা ওর সঙ্গীর হাতটা তুলে ধরলো। যেমন করে কশাই খদ্দেরকে মাংস দেখায় অনেকটা তেমনি করে। "ঘষতে হয় তো এই হাত—গ্যাখো কেমন মজবুত পেশী।"

ছেলেটা এমনি সময় এগিয়ে এল। শাসানোর স্বরে বলল : "ঢের হয়েছে—এবার ভাল চাও তো মানে মানে কেটে পড়।"

"তার মানে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।" ভীষণ রেগে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

এরপর যা ঘটল সারাজীবন আমার তা মনে থাকবে। ছেলেটা আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে টপ্‌ করে আমাকে একেবারে শূন্যে তুলে ফেললে—আমি যেন পালকে তৈরী। আগেই বলেছি একদিকে কতগুলি পোষা জানোয়ার ছিল। আমাদের ঠিক পেছনটাতে হাতির একটা পরিবার ছিল—বাপ মা ও একটা বাচ্চা হাতি। বাচ্চা হলে কি হবে, প্রায় একটা ঘোড়ার সমান। এই হাতি-পরিবার অন্ধকার এককোণে চুপচাপ কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটা করল কি, আমাকে ওই বাচ্চা হাতিটার পিঠে দুম্‌ করে বসিয়ে দিল। হাতিটা সার্কাসে ওর খেলা দেখাবার সময় এসেছে ভেবে আমাকে পিঠে নিয়ে দুলকি চালে চলতে শুরু করে দিল। চারদিকের লোকজন ছুটে এল। আইডা

আমার পাশে পাশে ছুটছিল আর সমানে চিৎকার করছিল। আমি হাতিটার উপর বসে দু'পাশে পা ঝুলিয়ে দিলাম, কিন্তু ওর কান দুটো ধরতে গিয়েও ধরতে পারলাম না। এরকম কিছুক্ষণ চলার পরে গড়িয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। মাথায় চোট পেলাম। এরপর কি ঘটেছে আর জানি না। হুঁস ফিরে আসতে দেখি ফার্ষ্ট এড-এর জায়গায় শুয়ে আছি। আইডা আমার পাশে বসে আছে, ওর হাতে আমার হাত ধরা। কিছুটা সুস্থ বোধ করতেই আমরা বাড়ি চলে এলাম। খেলার দ্বিতীয় পর্ব আর দেখা হল না।

পরদিন আইডাকে বললাম: "সব দোষ তোমার। তুমিই মাথাটা আমার বিগড়ে দিয়েছো। এমন সব কথা বলেছো যাতে মনে হয়েছে না জানি আমি কী একটা। কাল মেয়েটাই ঠিক কথা বলেছে, আমি একটা নেহাৎ গোবেচারা লোক ছাড়া কিছু নই।"

কিন্তু কার কথা কে শোনে। আইডা আমার হাতে ওর হাত তুলে নিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে বললে: "তোমার তুলনা নেই। আসলে ছেলেটা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল, বুঝলে? আর তাই অমন হড়বড় করে তোমায় হাতির পিঠে চড়িয়ে দিলে। তোমায় দেখাচ্ছিল যেন বিজয়ী বীরের মত। শুধু পড়ে গেলে এই যা।"

সুতরাং, আমি নিতান্ত নাচার। আইডার চোখে আমি একরূপে প্রতিভাত, আর দুনিয়ার লোকের কাছে অন্যরকম। মেয়েরা প্রেমে পড়লে প্রেমিকের মধ্যে কি খুঁজে পায় বলুন তো?

□ রাজকুমারী □

প্রাসাদের পেল্লায় সিঁড়িটা ভেঙে উঠতে উঠতে আ-তনিও খানসামা আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলে : "রাজকুমারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারবেন বলে মনেও ভাববেন না। কী যে ছোট মন ওঁর ধারণা করতে পারবেন না। সোয়ামী মারা যাবার পর থেকে সব কাজেই নাক গলানো চাই ওঁর, কারুকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

"কিন্তু ব্যাপারটা কি?—খিটখিটে মেজাজের বুড়িটুড়ি নাকি?" কথায় কথায় এমনি জানতে চাইলাম।

"বুড়ি? আরে না না মশাই, রীতিমত সোমথ যুবতী, তাছাড়া সুন্দরীও বটে। পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী বয়েস হবে না মশাই। দেখলে মনে হবে ডানাকাটা পরী। কিন্তু চেহারা দেখে বিচার করতে যাবেন না।"

আ-তনিওকে বললাম : "দ্যাখো বাপু, দেখতে ডাইনির মত হলেও ক্ষতি নেই কারণ আমার পাওনা টাকা নিয়ে কথা। বাড়ির দালালি করি, রাজকুমারী ঘর বেচবেন, আমি ওঁর হয়ে সেটা করে দেব। তারপর আমার কমিশনের টাকাটা পকেটস্থ করে কেটে পড়বো। ব্যাস্, এর বেশী আমার দেখবার দরকার কী?"

"আপনি মশাই ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছেন তত সহজ হবে না। হাড় হিম করে তবে উনি ছাড়বেন। বসুন, ততক্ষণে আমি ওঁকে খবর দি।"

আমাকে বসিয়ে আ-তনিও গেল রাজকুমারীকে খবর দিতে। ওই ঠাণ্ডা ঘরটায় বেশ খানিকক্ষণ ঠায় বসে রইলাম। শেষকালে আ-তনিও উদয় হল। বললো : "রাজকুমারী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।" বার মহলের কয়েকটা ঘর পেরিয়ে বড়ো একটা ঘরের কাছে এলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়লো রাজকুমারী বসে লিখছেন। আ-তনিও ওঁর কাছে গিয়ে সম্ভ্রমভরে বললো : "রাজকুমারী, সেনর প্রয়েত্তি।" চোখ না তুলেই রাজকুমারী বললেন : "ভেতরে আসুন, সেনর প্রয়েত্তি।" কাছে এসে ভাল করে দেখে ভাবলাম আ-তনিও একটুও বাড়িয়ে বলেনি। ডানাকাটা পরীর মতই অপরূপ সুন্দর

মুখখানি। কী কমনীয় কী মিষ্টি। এক রাশ কালো চুল। টানা টানা কালো চোখে দীর্ঘ পল্লবা টিকালো নাক। ছোট্ট ঠোঁট দুটি যেন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে। শরীরের নীচের দিকে তাকালাম। কালো পোশাক পরা। আঁটসাঁট জ্যাকেটে নিতম্ব ও উন্নত বুক ফুটেউঠেছে। এত সরু কোমর যে দু হাতের মুঠিতে ধরা যায়। এদিকে লিখেই চলেছেন রাজকুমারী। তর্জনীতে হীরের একটি আঙটি। চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি। চোখ তুলে চাইলেন। আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ। যেন হরিনী নয়না। "তাহলে প্রয়েত্তি, কামরা দেখে আসা যাক্।" কোমল আদুরে গলায় বললেন রাজকুমারী। "আজ্ঞে, চলুন।" আমতা আমতা করে বললাম। "এদিক দিয়ে আসুন, প্রয়েত্তি।" বলে লোহার বড় একটা চাবি হাতে তুলে নিলেন।

ওই একই ঘরগুলি আবার পেরিয়ে চললাম। কামরার দরজা খুলতে যেতেই আ-তনিওকে তিনি বললেন: "আ-তনিও, ওদের বলে দাও আর কয়লা যেন না দেয়—গরমে দম আটকে আসছে।" ওঁর কথা শুনে তো আমি অবাক। গরম তো দূরের কথা, ঘর ঠাণ্ডায় হিম। বড় সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগলাম আমরা। রাজকুমারী আগে আমি পেছনে। ফলে ওঁর গড়নপেটনটা ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। দেখলাম ওঁর গড়নও অতি অপূর্ব। লম্বা ছিপছিপে শরীরে কালো রঙের পোশাকে গলা ও হাতে শুভ্রতা আরো ফুটে উঠেছে। অনেকগুলো অনেক রকমের সিঁড়ির পর সিঁড়ি পেরিয়ে তবে পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন উনি। পেছন পেছন আমি। চোখ নামিয়ে নিলাম পাছে ওঁর পায়ের দিকে নজর চলে যায়। এরমধ্যেই ওঁকে আমি সশ্রদ্ধ চোখে দেখতে শুরু করেছি, যেমন চোখে প্রেমিকাকে দেখে প্রেমিক। এক নজরেই দেখে নিলাম বড়ো বড়ো দুটো ঘর। ইঁটের মেঝে। জানলায় আটকানো খড়খড়ি। জানলার একেবারে ওপরের দিকটা শুধু খোলা। ফলে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। তৃতীয় ঘরটা গোলমতন। রেলিং দেওয়া একটা ব্যালকনি আছে। বাদামী রঙের অনেকগুলো টালি ছাওয়া ঘরের ওপর ঝুলে আছে যেন। উনি ব্যালকনিতে এসে ডাকলেন: "আসুন প্রয়েত্তি, দেখুন কী চমৎকার দৃশ্য।" ব্যালকনি থেকে বাস্তবিকই এক বিস্তীর্ণ দৃশ্য চোখে পড়ে—অসংখ্য ছাদ গম্বুজ আর মিনারে ভরা রোম নগরীর গোটা চেহারা ভেসে ওঠে। আনমনাভাবে এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ওঁর কথাই

ভাবছিলাম কেবল। হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখি রাজকুমারী কখন ভেতরে চলে এসেছেন। চকিতে সামলে নিলাম নিজেকে। যান্ত্রিকস্বরে শুধোলাম : "আর সব ব্যবস্থা-সুবিধে ?"

"বাথরুমের কথা বলছেন ? এদিকে আসুন।" বলে এতক্ষণ নজর করিনি এমন ছোট্ট একটা দরজা খুলে নিয়ে এলেন একটা নীচু ছাদওলা চৌকোনো ঘরে। ঘরটায় একটাও জানালা নেই। খুব শস্তা সব সরঞ্জাম লাগিয়ে এটাকেই বাথরুম বানানো হয়েছে। দরজাটা ফের বন্ধ করে বড়ো ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন : "তাহলে প্রয়েত্তি, কত আমরা চাইতে পারি বলে মনে হয় আপনার ?"

ওঁর রূপে এমনভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম আর একান্তে ওই ছোট্ট ঘরটায় ওঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম যে সহসা মুখে কোনও কথা জোগাল না। সম্ভবত উনি আমার ভাবান্তর টের পেলেন। মেঝেয় ওঁর পা ঠুকে বললেন : "জানতে পারি কি, কী ভাবছেন আপনি ?"

মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললাম : "আজ্ঞে, হিসেব করে দেখছিলাম···তিনটে ঘর—কিন্তু লিফ্‌টের বন্দোবস্ত নেই, যিনি কিনবেন ওটা তাঁকেই করে নিতে হবে—আমার মনে হয় কি জানেন, সাড়ে তিরিশ লাখ লায়ার চাইলে ঠিক হয়।"

শোনামাত্র যেন আঁতকে উঠলেন উনি। গলা চড়িয়ে বললেন : "বলেন কি, আমি যে সত্তর লাখ চাইবো ভেবে রেখেছিলুম।"

সত্যি বলতে কি, খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। ওই অত রূপের সঙ্গে এই বেহিসেবী ব্যবসা বুদ্ধি কেমন যেন অস্বস্তিকর ঠেকল। শেষকালে আমতা আমতা করে বললাম : "কিন্তু রাজকুমারী, সত্তর লাখে কেউ নেবে না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন : "কিন্তু ভুলবেন না এটা পারিওলি ডিস্ট্রিক্ট নয়, এটা ঐতিহাসিক জায়গা—এটা রোমের কেন্দ্রস্থল।"

যাই হোক, কিছুক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। ওঁর কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অনর্গল কথা বলছিলাম আমি। আসলে কিন্তু এসব হিসেব নিকেশের কথা আদপেই চিন্তার চৌহদ্দতে ছিল না আমার। ওঁর, শুধু ওঁর চিন্তাই তখন গোটা মাথা জুড়ে বসে আছে। দুচোখ দিয়ে যেন গিলছিলাম ওঁর রূপসুধা। এছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি। শেষকালে একটা ফয়সালা হল। চল্লিশ লাখ লায়ারে রাজী হলেন রাজকুমারী। কিন্তু ভেবে দেখলাম,

দরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আরো যেসব কাজ না করলেই নয় সেটা করতেই আরো দশ লাখ লায়ার বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া আছে ট্যাক্স ও আরো হেন-তেন। সবসুদ্ধ ষাট লাখ লায়ার ভাড়াটেকে খরচা করতে হবে। একজন লোক আমার হাতে ছিল। তাই আর আটকাবে না এই কথা বলে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন একজন তরুণ স্থপতিকে নিয়ে রাজকুমারীর প্রাসাদে এসে হাজির হলাম। স্থপতিটি এই রকমই একটি জায়গা খুঁজছিল—ছবির মত দৃশ্যের শোভা চোখে পড়ে এমন একটি সুন্দর জায়গা আর যা ঠিক আর পাঁচটা জায়গার মত নয়। রাজকুমারী ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখালেন। স্থপতিটি দাম নিয়ে কিছুটা দর কষাকষি করে শেষটায় ওই চল্লিশ লাখ লায়ারেই রাজী হয়ে গেল।

পরদিন সকাল আটটা হবে কিনা সন্দেহ এমন সময়ে আমার স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললে রাজকুমারী ফোনে ডাকছেন। ঘুম ঘুম চোখে ফোনটা ধরলাম। শুধু কানে এল রাজকুমারীর অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর। খালি পায়ে পাজামা পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই সঙ্গীত সুধা পান করতে লাগলাম। আর আমার স্ত্রী এরমধ্যে আমার পায়ে চটি পরিয়ে দিল, গায়ে ওভারকোটটা চড়িয়ে দিল। এদিকে রাজকুমারী অজস্র কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাঁর এক বর্ণ কথাও বোধগম্য হচ্ছিল না। হঠাৎ দুটি শব্দ কানে আসতেই সচকিত হলাম "—পঞ্চাশ লাখ।"

তৎক্ষণাৎ আমি বললাম: "কিন্তু রাজকুমারী আমরা যে চল্লিশ লাখে কথা দিয়েছি—সে কথার তো আর নড়চড় করা চলে না—"

"ব্যবসায় কথাটথা বলে কিছু নেই। পঞ্চাশ লাখের কমে চলবে না।"

"কিন্তু রাজকুমারী, ভদ্রলোক তাহলে পিছিয়ে যাবেন।"

"বাজে বোকো না প্রয়েত্তি। সোজা কথা পঞ্চাশ লাখ চাই, বুঝলে?"

সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর ওই অপরূপ সুরেলা গলায় বলা 'বাজে বোকোনা' কথাটা শুনে খারাপ লাগা বা অপমানিত বোধ করা কোনটাই হল না, বরং মনে হল ওঁর কাছের জন হয়ে উঠেছি। বললাম, ঠিক আছে ওঁর কথা মতই কাজ হবে। ভদ্রলোককে ফোনে কথাটা জানিয়ে দিলাম। শুনতে পেলাম ভদ্রলোক রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন: "আপনারা কি মশাই তামাশা পেয়েছেন নাকি? একদিনেই দাম বেড়ে গেল দশ লাখ!"

"আমার কিছু করার জো নেই। আমার ওপর যা হুকুম হয়েছে তাই বলছি মাত্র।"

"ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি।"

"আমায় জানাবেন তাহলে আপনি?"

"হ্যাঁ, ভেবে দেখি।"

বলা বাহুল্য, স্থপতি ভদ্রলোকের সঙ্গে ওখানেই ইতি। এরপর শুরু হল, যাকে বলা যায় রাজকুমারীর সঙ্গে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সময়। প্রতিদিন গড়ে অন্তত তিনবার তিনি আমাকে ফোন করতেন। আর প্রতিবারই আমার স্ত্রী টেলিফোনটা আমার হাতে দিয়ে শ্লেষের সুরে বলতেন: "তোমার রাজকুমারীর ফোন।" যেন প্রেমিকার কাছ থেকে ফোন এসেছে এমন মনে হত আমার। অথচ আসলে ব্যাপারটা আদৌ সেরকম কিছু ছিল না। টাকা জিনিসটা তিনি এমন ভালবাসতেন যা বিশ্বাস করা শক্ত। অর্থগৃধ্নুতায় সুদখোরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া কী ধূর্ত ব্যবসাবুদ্ধি আর ইতর একগুঁয়েমি। একেক সময় মনে হত, হয়ত ওঁর হৃদপিণ্ডের জায়গায় একটা টাকার থলে রয়েছে। টাকাই ধ্যানজ্ঞান। এদিকে নানান অজুহাতে রোজই ফোনে ভাড়ার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেছেন। এবার আমি শক্ত হলাম। ওই পঞ্চাশ লাখের বেশী বাড়াতে রাজী হলাম না। ওই পঞ্চাশ লাখ শুনেই অনেক খরিদ্দার কেটে পড়লেন। তাই ওর বেশী আর বাড়াই কী করে? এমন সময়ে দৈবাৎ এক মিলানের ব্যবসায়ীর দেখা পেয়ে গেলাম। জায়গাটা ওঁর অসম্ভব ভালো লেগে গেল। ওঁর একটি বান্ধবীর জন্য ওটা পছন্দ করে ফেললেন। মাঝবয়সী এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি নিতান্তই কাঠখোট্টা ধরণের মানুষ। বাজারের হালচাল জানেন আর পয়সার দাম বিলক্ষণ বোঝেন। কামরা ভাল করে দেখেটেখে কোনরকম ভনিতা না করেই রাজকুমারীকে বললেন: দেখুন, এতো নেহাত পায়রার খোপ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। মিলানে হলে একে আমরা লণ্ড্রি বানাতাম। পঞ্চাশ লাখ এর ভাড়ার তো প্রশ্ন ওঠে না তাছাড়া এখানকার মেঝে জানলা, সাজসরঞ্জাম সবই তো পাল্টাতে হবে। আর এসমস্ত করতে খরচ পড়ে যাবে সত্তর থেকে আশী লাখের মতো।—যাই হোক, ঘাবড়াবেন না, আপনারা ঠিক লোককেই পাকড়েছেন, এ ঘর আমি নেবো।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি কিন্তু এরকম চাঁচাছোলা ভাবে কথা বলে ভাল করলেন

না মোটেই। তাঁর প্রস্থানের পরই রাজকুমারী করুণ স্বরে বললেন: 'প্রয়েত্তি, বড্ড ভুল করে ফেলেছি।'

"কী ভুল ?"

"মোটে পঞ্চাশ লাখ চাওয়াটা ভুল হয়ে গেছে। লোকটা সত্তর লাখ অবধি দিত।"

আমি বললাম, "দেখুন রাজকুমারী, আপনার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে। লোকটাকে আপনি ঠিক চিনতে পারেন নি। লোকটা নিঃসন্দেহে ধনী আর বান্ধবীকে যে যথেষ্ট সোহাগ করে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পঞ্চাশ লাখের বেশী সে কিছুতেই দেবে না।"

"আপনি জানেন না, প্রেমিকার জন্যে প্রেমিক কী না করতে পারে।" রাজকুমারী তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর চোখদুটি মেলে বললেন। কিন্তু ওই চোখে শুধুই অর্থলোলুপতা ফুটে উঠলো। আমতা আমতা করে বললাম: "হতে পারে—তবে আমার কিন্তু মনে হয় আমার ধারণাই ঠিক।"

পরদিন মিলনবাসী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক একজন উকিল সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে এসে হাজির হলেন। আমরা বসতে না বসতেই রাজকুমারী বলে উঠলেন: "সেনর কাসিরেঘি, কিছু মনে করবেন না, কাল যে ভাড়া আপনাকে বলেছিলাম তাতে আমার ঠিক পোষাচ্ছে না।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, আমি ষাট লাখ চাই।"

একথা শুনে কাসিরেঘির মুখের ভাব দেখার মতো। একটাও কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: "রাজকুমারী, আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।" বলে মাথা একটু নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল। সে চলে যেতেই বললাম: "কেমন দেখলেন তো, আমার কথাই ঠিক ?"

কিন্তু এতে বিচলিত হবার পাত্রী রাজকুমারী নন। বললেন: 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা ষাট লাখেই ঠিক খদ্দের পেয়ে যাবো।'

প্রচণ্ড ইচ্ছে হল একটা যাচ্ছেতাই গালাগাল দিই। কিন্তু তার উপায় কি, আমি তখন রীতিমতো ওঁর প্রেমে পড়ে গেছি। আর ঠিক সে কারণেই হয়ত কিছুদিন বাদে পঞ্চাশ লাখের যে খদ্দের জুটিয়ে আনলাম তাকে ভাল করে নজর করে দেখিনি। এত বড় অঙ্ক শুনেও লোকটা এতটুকু ঘাবড়াল না। পল্লীগ্রামের

ভদ্রলোক এই যুবকটি ভালুকের মত লম্বাচওড়া দেখতে। নাম পান্দলফি। প্রথম থেকেই সুবিধের লাগল না লোকটাকে। মনে কেমন একটা খটকা লাগল যেন। রাজকুমারীর কাছে ওকে নিয়ে যেতেই বুঝলাম কেন লোকটা অত বড় অংক শুনেও পিছিয়ে যায়নি। যেমন, মনে হল, ওদের দুজনেরই বন্ধুবান্ধবের ব্যাপারে মিল রয়েছে। তাছাড়া যেমন ধরণে সে তাকাল রাজকুমারীর দিকে তাতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। একেও যথারীতি ঘর তিনটি দেখানো হল। তারপর বাথরুম। সবশেষে বালকনিতে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখাতে ওকে নিয়ে গেলেন রাজকুমারী। আমি ঘরে রইলাম। ওদের ওপর নজর রাখলাম। দেখলাম রেলিঙের ওপর দুজনের হাত। যেন এমনিই, লেগেছে এভাবে লোকটার হাত রাজকুমারীর হাতে ছোঁয়া লাগল, তারপর ধীরে ধীরে ওঁর হাতের ওপর লোকটা হাত রাখল, হাতটা হাতে তুলে নিল। আমি গুনতে শুরু করে দিলাম। কুড়ি অবধি গুনলাম উফ্ সে কী গর্ভযন্ত্রণা!—দেখি, রাজকুমারী খুব সহজভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। ঘরে চলে এলেন। লোকটাও সহজভাবে এসে বলল ঘর তার পছন্দ হয়েছে। সে চলে গেল। রাজকুমারী তখন আমার দিকে ফিরে বললেন: "দেখলে প্রয়েত্তি, পঞ্চাশ লাখ—কিন্তু আমার মনে হয় আরো বাড়ানো যাবে।"

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি রাজকুমারী যথারীতি ড্রয়িংরুমে ডেস্কের সামনে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন: "জানো প্রয়েত্তি, কাল তোমার মক্কেলের সঙ্গে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখবার সময় একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করেছি?"

ইচ্ছে হল বলি, "লোকটা আপনার প্রেমে পড়ে গেছে, এই তো?" কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। উনি বলে চললেন, "দেখলাম, এক কোণে বর্ঘিস গার্ডেন্সের বেশ খানিকটা দেখা যায়। বুঝলে প্রয়েত্তি, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে—আজ আমরা সেনর পান্দলফির কাছে সাড়ে ষাট লাখ চাইবো।"

অবস্থা দেখেছেন? উনি বিলক্ষণ টের পেয়ে গেছেন পান্দলফি ওঁর প্রেমে পড়েছে, আর উনি সেটার সুযোগ নিতে চাইছেন। যে কুড়ি মিনিট ওঁর হাত সে ধরে ছিল তার জন্যে দাম ধরে দিতে হবে দশ লাখ। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের জন্য পঞ্চাশ হাজার লায়ার। কী দুর্দান্ত লোভ। আমার মনে হল এবার এই দাঁও ওঁর হাতছাড়া হবে না। হঠাৎ রাগে বিদ্বেষে আর ঈর্ষায় আমার সমস্ত

মন ভরে গেল। এতক্ষণ আমি ছিলাম বাড়ির দালাল, এখন উনি চাইছেন আমি প্রেমের ব্যাপারে দূতীয়ালি করি। নিজের অজান্তেই রাগে ফেটে পড়লাম: "দেখুন রাজকুমারী আমি বাড়ির দালাল, মাগির দালালি করি না।" বলেই রাগে মুখ লাল করে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলাম। একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে ওঁকে বলতে শুনলাম: "কি ব্যাপার প্রয়েত্তি?" ওঁর সুরেলা গলায় শোনা এই শেষ কথাটি আজো কানে বাজে।

মাস কয় বাদে আন্তনিও খানসামার কাছে ছুটে গেলাম। বললাম: "রাজকুমারীর খবর কি বলো তো?"

"বিয়ে করছেন রাজকুমারী।"

"কাকে? নিশ্চয়ই ওই পান্দলফিকে?"

"পান্দলফিকে? তাই বটে!—দক্ষিণ ইতালির এক রাজকুমারকে বিয়ে করছেন উনি। ওঁর ঠাকুর্দার বয়েসী—কিন্তু পয়সাওলা লোক যে তিনি। রাজকুমারী বলেন তিনি নাকি আদ্দেক ক্যালাব্রিয়ার মালিক—রতনে রতন চেনেই বটে।"

"রাজকুমারীর চেহারা এখনো সুন্দর আছে তো?"

"তেমনি পরীর মতোনই সুন্দরী।"

□ মানিকজোড় □

সেরাফিনো আর আমি বন্ধু। কাজকর্ম অবিশ্যি দুজনের দু ধরনের। সেরাফিনো বিরাট ধনী শিল্পপতির শোফার আর আমি সিনেমার ক্যামেরাম্যান ও ফটোগ্রাফার। চেহারার দিক দিয়েও বিশেষ মিল নেই। সেরাফিনোর মাথায় একরাশ কোঁকরা চুল, মুখখানা কচি-কচি ও গোলাপী রঙের, চোখ দুটি উজ্জ্বল নীল। আর আমার গায়ের রং একটু চাপা, বয়স্ক লোকের মত ভারিক্কি মুখ, গর্তে-বসা কালো চোখ। চেহারার চেয়েও চরিত্রের দিক দিয়েই আমরা সত্যিকার আলাদা প্রকৃতির। সেরাফিনো কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলে। আর আমার মিথ্যে কথা মোটেই মুখে জোগায় না। এক রোববার সেরাফিনো জানাল আমাকে ওর দরকার। ওর বলার ধরনেই কেমন সন্দেহ হল কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। কারণ ওর স্বভাবই ওস্তাদি দেখাতে গিয়ে কোন একটা ঝামেলা পাকানো। যাই হোক, পিয়াজ্জা কলোন্নার একটা কাফেতে গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। একটু বাদেই দেখি শ্রীমান হাজির। প্রথমেই পয়লা নম্বর ওস্তাদি (বা মিথ্যেও বলা যায়) চোখে পড়ল। দেখি ওর মালিকের দামী 'স্পেশাল মডেল' মোটরগাড়িখানা হাঁকিয়ে এসেছে। আমি জানতাম ওর মালিক তখন রোমে ছিল না। আমায় দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাত নেড়ে এমন ভঙ্গিতে গাড়িখানা চালিয়ে পার্ক করে রাখল যেন ওটা ওরই গাড়ি। কাছে এগিয়ে আসতে দেখলাম বাবু খুব সেজেগুজে এসেছেন। হলদে-রঙা কর্ডরয়ের চোঙা প্যান্ট, গায়ে জ্যাকেট, গলায় রঙীন রুমাল। কেমন গা গুলিয়ে উঠল আমার। বসতেই বললাম: "লক্ষপতির মতো দেখাচ্ছে তোমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভভাবে ও বলল: "সত্যিই আজ আমি লাখপতি।" তক্ষুনি বোঝা গেল না কি বলতে চায় ও। তাই বললাম, গাড়িটা কার? লটারিতে টাকা পেয়েছো নাকি?

"ও, গাড়িটা? ওটা মালিকের গাড়ি। নতুন কিনেছে।" খুব সহজভাবে বলে গেল কথাটা। তারপর আসল কথায় এল। "শোনো মারিও, দু'জন মহিলা আজ আসছেন এখানে—বয়েস বেশী নয়—তরুণী বলতে পারো—বুঝতেই

পারছো, তোমার কথাও ভেবেছি আমি—দু'জনের জন্যে দু'জন—ভাল ঘরের মেয়ে ওঁরা, ওঁদের বাপ রেলের ইঞ্জিনীয়ার—তা শোনো, আজ তুমি হলে ফিল্ম প্রোডিউসার, বুঝলে তো ? দেখো বাবা, ডুবিয়ো না আমাকে।"

"আর তুমি ? তুমি কি ?"

"আমি ? কেন, লক্ষপতি ?"

মুখে কিছু না বলে উঠে দাঁড়ালাম। "আরে আরে করো কী ? চলে যাচ্ছ না কি ? ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সেরাফিনো।

"হ্যাঁ, চললুম। জানোই তো মিছে কথা আমি ভালবাসি না। চলি তাহলে, আশা করি সময়টা ভালই কাটবে তোমাদের।"

"আরে রোসো রোসো। তুমি যে আমার প্লানটাই ভেস্তে দিচ্ছ হে।"

"মোটেই না। আমি কিছুই ভেস্তে দিচ্ছি না।"

"একটু দাঁড়াও না। ওরা যে তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চায়।"

"কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না।"

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। সেরাফিনো বসে আর আমি ওর সামনে দাঁড়িয়ে। শেষটায় নেহাৎ বন্ধুত্বের খাতিরে আমি রাজী হলাম থাকতে। তবে ওদের সাবধান করে দিয়ে বললাম: "দ্যাখো, এই অভিনয় আমি কদ্দুর চালিয়ে যেতে পারবো তা কিন্তু বলতে পারছিনে।" সেরাফিনো আমার এ কথায় কান দিল না। হঠাৎ দেখি একমুখ হাসি নিয়ে বলছে: "ওঁরা এসে গেছেন।"

প্রথমটায় চুল ছাড়া আর কিছুই ঠাহর হলনা। মনে হল ওদের দুজনের মাথায় এক গোছা করে ঘন কোঁকড়া চুলের বোঝা ফুলে ফেঁপে আছে। এরপর ধীরে ধীরে চুলের ওই বিরাট গোছার তলায় লম্বা সরু মুখ চোখে পড়ল, মনে হল পাখির বাসা থেকে দু'টি পাখি যেন উঁকি দিয়ে আছে। দেখলাম দুজনেরই সুডৌল শরীর। খুব সরু কোমর এবং খুব ভরা বুক আর পাছা। ভাবলাম দুজনে বোধহয় যমজ বোন। কারণ দুজনেরই একরকম পোশাক। একই রকম টার্টান স্কার্ট, কালো জাম্পার, লাল জুতো এবং হাতে ব্যাগ। সেরাফিনো কেতাদুরস্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল। পরিচয় করিয়ে দিল: "আমার বন্ধু মারিও ফিল্ম প্রোডিউসার, আর ইনি সেনোরিনা আইরিস, ইনি সেনোরিনা সিমোসা।"

ওঁরা বসতে এবার ভালভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। সেরাফিনোর হাবভাব

দেখে বুঝলাম আইরিসকে নিজের জন্যে রেখেছে আর আমার জন্যে মিমোসাকে। ওরা অবশ্য যমজ নয়। কারণ মিমোসা নিঃসন্দেহে তিরিশ আর আইরিসের বয়েস বছর কুড়ির বেশী হবে না। তাছাড়া মিমোসাকে দেখতে প্রায় কুৎসিত বলা যায় আর আইরিস রীতিমতো আকর্ষণীয়া। এছাড়া আরেকটা জিনিস আমার চোখে পড়ল। দেখলাম ওদের দু'জনেরই হাত লাল রঙা আর ফাটা-ফাটা। অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত তরুনীর হাতের চেয়ে কাজ করা মেয়েদের হাতের মতই মনে হয়। এদিকে ওরা আসার পর থেকেই সেরাফিনো নেহাৎ ক্যাবলার মত অনর্গল বকে যাচ্ছিল : ওদের আসতে দেখে কত খুশী হয়েছে, কেমন সুন্দর বাদামী রঙ ওদের, এই গ্রীষ্মে কোথায় গিয়েছিলেন ওঁরা ইত্যাদি।

মিমোসা শুরু করল : "গিয়েছিলাম ভেন্-কিন্তু আইরিস ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল : ভিয়োরোগিওতে গিয়েছিলাম।" বলেই ওরা দুজন দুজনের দিকে চেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সেরাফিনো উসখুস করে বলে উঠল : "ব্যাপার কি, হাসছেন কেন আপনারা ?"

মিমোসা বলল : "ও কিছু নয়। আমার বোনের বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম—আসলে প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম ভেনিসে। হোটেলে উঠেছিলাম। এরপর যাই ভিয়ারোগিওতে-ওখানে আমাদের একটা ছোটখাট ভিলা আছে।"

মিমোসা যেভাবে চোখ নামিয়ে কথাটা বলল তাতে আমার মনে হল ও মিথ্যে কথা বলছে। মিমোসা অনেকটা আমার মতো। আমিও মিথ্যে কথা বলার সময়ে মুখের দিকে তাকাতে পারি না। তারপর শান্তসুরে মিমোসা বলল : "সেনর মারিও, সেরাফিনোর কাছে শুনেছি আপনি একজন ফিল্ম প্রোডিউসার—আর আপনি নাকি আমাদের একটা ফিল্ম টেষ্ট নেবেন বলেছেন।"

কথা শুনে তো আমি হতভম্ব। সেরাফিনোর দিকে তাকাতেই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। বললাম : "কি জানেন সেনোরিনা, ফিল্ম টেষ্ট নেওয়া আর ছোটখাট একটা ছবি তোলা প্রায় একই ব্যাপার। এতো ঠিক হুট করে হবার জিনিস নয়। এর জন্যে একজন পরিচালক, একজন ক্যামেরাম্যান, একটা ষ্টুডিও এসব চাই—সেরাফিনোর ঠিক ধারণা নেই এ ব্যাপারে—যাহোক, এর মধ্যে একদিন নিশ্চয়ই —।"

"এরমধ্যে একদিন মানে কোনদিনই নয়।"

"আরে না না, সেনোরিনা, আমি কথা দিচ্ছি—"

"না না ওসব কোন কথা শুনছিনা।" মিমোসা আমার হাত ওর হাতে তুলে নিয়ে চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছে। বুঝলাম ফিল্ম টেষ্টের কথা বলে সেরাফিনো ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। তাই আবার ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ফিল্ম টেষ্ট বলামাত্রই নেওয়া যায় না। ধীরে ধীরে ওর কানে জল গেল। আমার হাতের ওপর ওর হাতের চাপ শিথিল হয়ে এল। বোনের দিকে ফিরে বলল (বোন তো এদিকে সেরাফিনোর সঙ্গে অনর্গল বকেই চলেছে): "তখনই বলেছিলাম, ব্যাপারটা স্রেফ গুল—যাহোক. এখন করবোটা কি আমরা? বাড়ী চলে যাবো?"

এমনটা যে হবে আইরিস তা ভাবেনি। একটু উসখুস করে বলল: "আজকে সন্ধ্যেটা অব্দি থেকে গেলে হয় না?"

"নিশ্চয়ই," সেরাফিনো বলল, "চলুন, সবাই মিলে গাড়িতে করে বেরনো যাক।"

"আপনার গাড়ি আছে?" মিমোসা বলল। বোঝা গেল, অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

"হ্যাঁ, ওই তো।" বলে আঙুল দিয়ে গাড়িটা দেখাল। গাড়িটা দেখেই মিমোসার সুর পাল্টে গেল। বলল: "তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক—কাফেতে বসে কথা বলতে আমার একটুও ভাল লাগে না।"

আমরা চারজনই উঠে দাঁড়ালাম। আইরিশ সেরাফিনোর সঙ্গে এগিয়ে গেল। মিমোসা আর আমি পেছনে পাশাপাশি। হাঁটতে হাঁটতে মিমোসা আমাকে বলল: "আপনি কিছু মনে করেন নি তো? কি জানেন, হবে-হবে শুনে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এবার আপনি একটা টেষ্ট নেবেন তো?"

বুঝলাম আমার সব কথাই ব্যর্থ হয়েছে। এখনো টেষ্ট নেবার আশায় বসে আছে। কোন কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসলাম। পেছনের সীটে আমি আর মিমোসা, সামনে সেরাফিনো আর আইরিস।

"কোন্ দিকে যাওয়া যায়?"—সেরাফিনো শুধোল। মিমোসা ফের আমার হাত তুলে নিল ওর হাতে। চাপ দিতে লাগল। নীচু গলায় আমাকে মিষ্টি করে বলল: "শুনুন না, ওকে বলুন ষ্টুডিওতে নিয়ে যেতে। আজই টেষ্টটা হয়ে যাক।" প্রচণ্ড রাগ হল আমার। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। মিমোসা গলাটা আরো নীচু করে বলল: "দেখুন, আপনি আমার একটা টেষ্ট নিয়ে নিন,

আপনাকে একটা চুমু খেতে দেব।"

হঠাৎ উৎসাহ পেলাম মনে। বললাম: "তাহলে চলুন সেরাফিনোর বাড়িতে যাওয়া যাক—বেশ সুন্দর বড় বাড়ি ওর—ওখানে আপনাদের আরো ভালভাবে দেখে বলা যাবে টেষ্ট নেওয়া যাবে কি না।"

লক্ষ্য করলাম, কথাটা শুনে সেরাফিনো আমার দিকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে একবার তাকাল। ওর ভাবখানা, মালিকের গাড়িটা না হয় নিজের বলে চালিয়েছে, তাই বলে বাড়িটা চালাবে কি করে? সেরাফিনো আপত্তির স্বরে বলে উঠল: "আর তার চেয়ে বরং বেশ খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে হয় না?" কিন্তু ভবী ভোলার নয়। ওরা, বিশেষ করে মিমোসা বেঁকে বসল। বেড়াতে ওরা মোটেই উৎসাহী নয়, ওরা চায় ফিল্ম টেষ্টের ব্যাপারটা ঢুকিয়ে ফেলতে। সেরাফিনো বেচারা কি আর করে। গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে এল পারিওলি ডিস্ট্রিকেট—ওর মালিকের পাড়ায়। সারাটা রাস্তা মিমোসা আমার পাণিপীড়ন করে চলেছিল। আর সারাক্ষণ নীচু স্বরে আদুরে গলায় আমার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। আমার কানে যাচ্ছিল না কোন কথাই। থেকে থেকে শুধু একটি কথা হাতুড়ির বাড়ির মত বাজছিল: "বুঝলেন, টেষ্টটা··টেষ্টটা নেবেন তো আপনি?·টেষ্টটা যদি দিতে পারি···

পারিওলি ডিস্ট্রিকেট এসে পৌছলাম। ফাঁকা রাস্তার দুপাশে বড়লোকের বাড়ি সারি সারি। সেরাফিনোর মালিকের বাড়িতে এসে গেলাম। কালো মার্বেল পাথরে তৈরী সামনের হলঘর। মেহগনির তৈরী লিফ্‌ট। চারতলায় উঠে এলাম। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি অন্ধকার, আর ন্যাফথালিনের গুমোট গন্ধে চারদিকে ছড়াছড়ি। সেরাফিনো জানাল: "কিছু মনে করবেন না, এখানে ছিলাম না তাই দেখছেন তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে।" বসবার ঘরে এলাম। সেরাফিনো ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। ছাই-রঙা কাপড়ে ঢাকা একটা ডিভানে বসলাম আমরা। আমার পরিকল্পনাকে তখন কাজে রূপ দিতে গিয়ে বললাম: "আমরা দুজনে এখন আপনাদের একটু ভাল করে আগে দেখে নেব। আপনারা দুজন একটুখানি হাঁটুন···তাতেই ফিল্ম টেষ্ট সম্পর্কে আঁচ করে নেবো।"

"পা দেখাতে হবে আমাদের?" মিমোসা জানতে চাইল।

"আরে না-না—খালি একটু হাঁটুন, ওতেই হবে।"

একান্ত বাধ্যের মত ওরা আমাদের সামনে চকচকে কাঠের মেঝের ওপর হাঁটতে লাগল। ওদের চেহারা যে বেশ সুঠাম তা মানতেই হবে। অত চুল মাথায়, সুডৌল বুক আর পাছা, এবং সরু কোমর মিলে দিব্যি খাসা যে দেখাচ্ছিল সেটা না মেনে উপায় কী। কিন্তু একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। দেখলাম, ওদের হাত আর পায়ের পাতা কেমন বড়-বড় আর বেঢপ যেন। তাছাড়া পা একটু বাঁকা আর তেমন নমনীয় নয়। সত্যি বলতে কি, একটু হেঁটে যাওয়ার পার্টও ফিল্ম প্রোডিউসাররা ওদের দেবে না, এমনি দেখতে ওরা। এদিকে ওরা হেঁটেই চলেছে আর মাঝে মাঝে হাসছে। হঠাৎ বলে উঠলাম: "ঠিক আছে। এবার বসুন।"

ওরা বসে পড়ল। উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। "দেখুন, আমি দুঃখিত। আপনাদের দিয়ে চলবে না।" নীরস গলায় বললাম।

"কেন?"

"দেখুন," গম্ভীরভাবে বললাম, "আমার ছবির জন্যে ঠিক আপনাদের মত শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না মহিলার দরকার নেই।—আমি চাই চাকরি করে এমন মেয়ে, দরকার হলে যাতে দু'পাঁচটা কড়া কথাবার্তা কইতে পারে—যারা, এই ধরুন, অশিক্ষিত, চাষাড়ে ধরনের—অথচ আপনারা হলেন গিয়ে একজন ইঞ্জিনীয়রের মেয়ে, ভাল পরিবার থেকে এসেছেন—আমি যা চাইছি তা তো আপনাদের দিয়ে ঠিক হবে না।"

সেরাফিনোর দিকে তাকালাম। দেখলাম বেচারা ডিভানে গা এলিয়ে দিয়েছে। কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। মিমোসা বসল: "একথা বলছেন কেন? চাকুরে মেয়েদের মত অভিনয় তো নিশ্চয়ই করতে পারি আমরা?"

"না, পারেন না। কিছু কিছু জিনিস সংসারে আছে যা জন্মসূত্রে না পেলে হয়না।"

কিছুক্ষণের নীরবতা। আমার টোপ আমি ঠিকই ফেলেছি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস মাছ টোপটা গিলবেই। যা ভেবেছি তাই। একটু বাদেই মিমোসা উঠে ওর বোনের কানে কানে কি যেন বলল। বোনের মুখ দেখে বোঝা গেল বিশেষ প্রসন্ন নয় সে, যদিও সম্মতিসূচক একটা ভঙ্গি করল। এবার মিমোসা পাছার ওপর হাত রেখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। আমার বুকে একটা খোঁচা মেরে বলল: "শুনুন মশায়, কাদের সঙ্গে কথা বলছেন বলে মনে হয়

আপনার ?"

মুহূর্তে মিমোসা একেবারে সম্পূর্ণ পাল্টে গেল বললে অবিশ্যি বেশী বাড়িয়ে বলা হয়। আসলে ও যেন এতক্ষণে ওর আসল স্বরূপ নিয়ে দেখা দিল। হেসে জবাব দিলাম: "কেন, ইঞ্জিনীয়রের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছি।"

"আজ্ঞে না মশায়, আপনি যা চাইছেন আমরা ঠিক তাই। আইরিস অফিসে চাকরি করে, আর আমি নার্স—"

"তাহলে, ভিয়ারেগি্ওতে আপনাদের ভিলা—"

"ওসব ভিলা-টিলা কিছুই নেই। অষ্টিয়াতে গিয়েছিলাম, তাতেই গায়ের চামড়াটা পুড়ে বাদামী হয়েছে।"

"কিন্তু, এতসব মিথ্যে কথা বলার মানে ?"

আইরিস সরলভাবে উত্তর দিল: "আমি মোটেই বলতে চাইনি—কিন্তু মিমোসা বলে, লোকের চোখে ধূলো দেওয়া চাই।"

মিমোসা এবার সোজাসুজি কবুল করল: "তা নয়ত সেনর সেরাফিনো আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন না···মিথ্যে কথায় কাজ হল তাই বলা···যাক্‌গে, আমাদের ফিল্ম টেষ্টের কি হল তাই বলুন।"

হাসতে হাসতে জবাব দিলাম: "ওটা তো হয়ে গেছে। আপনারা যে চমৎকার দুটি চাকুরে মেয়ে সেটা তো বোঝা গেল। তাছাড়া, কি জানেন, মিথ্যের জবাবে মিথ্যে। আমিও ফিল্ম প্রোডিউসার নই, সাধারণ একজন ক্যামেরাম্যান মাত্র। আর সেরাফিনো যে অভিজাত ভদ্রলোকটি সেজে আছে তা মোটেই নয় ও, শোফার মাত্র।"

মানতেই হয়, মিমোসা আঘাতটা দারুণভাবে সামলে নিল। বলল: "ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ আগেই আমি করেছিলাম।" একটু দুঃখিত স্বরে বলল: "আমাদের কপালটাই খারাপ। শোফার ছাড়া গাড়ি আছে এমন কারু সঙ্গে আলাপই হল না আমাদের·· আইরিস, চলে এসো।"

এতক্ষণে সেরাফিনো ধাতস্থ হল, বলল: "দাঁড়ান। যাচ্ছেন কোথায় আপনারা ?"

"চলে যাচ্ছি, মিথ্যেবাদী মশাই।"

হঠাৎ আমার মায়া হল। বিশেষ করে আইরিসের জন্যে। এত ফুটফুটে দেখতে মেয়েটা, আর এত আঘাত পেয়েছে যে ওর চোখে জল এসে গেছে।

বললাম : "আমি বলি কি, মিথ্যে কথা তো আমরা চারজনই বলেছি—তা যা হবার তা তো হয়েই গেছে—সবাই মিলে সিনেমায় গেলে কেমন হয় ?"

কিছুক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। আইরিস যেতে চাইছিল। কিন্তু মিমোসা তখনো রেগে টং। সেরাফিনো বেচারার রা কাড়বার সাহসটুকু পর্যন্ত ছিল না। শেষকালে মিমোসাকে এইবলে রাজী করালাম : "দেখুন আমি ক্যামেরাম্যান, প্রোডিউসার নই ঠিকই—কিন্তু একজন সহকারী পরিচালকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তার সঙ্গে আইরিসের আলাপ করিয়ে দিতে পারি। এতে কতটা কাজ হবে বলতে পারি না—তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল। আপনার জন্যে কিছু করা যাবে না, তবে আইরিসের জন্যে কিছু হলেও হতে পারে।"

সুতরাং সিনেমা দেখতে চলে গেলাম আমরা। তবে মোটর গাড়িতে নয়, বাসে চেপে। সিনেমা হলে সেরাফিনোর গা ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল আইরিস। বোঝা গেল, মিথ্যেবাদী একটা লোফার হওয়া সত্ত্বেও সেরাফিনোকে সে যথেষ্ট পছন্দ করে। মিমোসা কিন্তু চুপচাপ বসে রইল। বিরতির সময়ে সে আমায় বলল : "দেখুন, আইরিসকে আমি অনেকটা মেয়ের মত দেখি—দেখতে তো ও বেশ সুন্দরী, তাই না ? আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন মনে রাখবেন—কথার খেলাপ হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।"

"কাপুরুষ ছাড়া কথা কেউ দেয়ও না, রাখেও না।" ঠাট্টা করে বললাম।

"কথা আপনি দিয়েছেন আর কথা আপনাকে রাখতে হবে। আইরিসের ফিল্ম টেষ্ট নেওয়া হবে, হবেই।" মিমোসা বলল।

□ কেয়ারটেকার □

একা একা থাকতেই ভাল লাগে আমার। অবশ্য এর কারণও আছে। চোখে চশমা আর গলার স্বরটা একটু মেয়েলি বলে লোকে আমাকে নিয়ে মশকরা করে। পেছনে লাগে। ফলে উত্তেজিত হয়ে পড়ি আর সমানে তোতলাতে আরম্ভ করি। সেজন্য কোম্পানী যখন ভিয়া স্যালারিয়া ধরে পনেরো মাইলটাক দূরে একটা ডিপোর কেয়ারটেকারের কাজটা আমায় দিল, একেবারে বর্তে গেলাম। সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট এক উপত্যকা। আর ডিপোটা ওখানেই। উপত্যকার নীচে চার দেওয়ালে বন্দী একটা ধুলোভর্তি লক্ষ্মীছাড়া পরিবেশ কল্পনা করুন। এবার আসুন, দেখুন, ইঁট পাঁজা করে করে তৈরী হয়েছে এই দেয়াল আর দেয়ালের গায়ে সার-সার উঁচু নীচু কতগুলো কুটির। হেন জিনিস নেই যা এই কুটিরে নেই। বস্তাভর্তি সিমেন্ট, পাইপ, টালি, পিপে, স্তূপীকৃত কড়িবরগা, ইঁট—কী নেই। এরই একটা কুটিরে আমার আস্তানা জুটল। এতে আছে দু খানা করে খালি কামরা, একটা ক্যাম্প খাট, একটা টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার। এখানে এলে আপনার মনে হবে যেন খোলা জায়গায় এসে পড়েছেন। জনকোলাহল থেকে অনেক দূরে। তবে কাছেরই কোনও পাহাড়ে চড়লে দেখা যাবে খুব কাছাকাছি দু-সারি গাছের মাঝখান দিয়ে বরাবর চলে গেছে ভিয়া স্যালারিয়া। আর রাস্তা ধরে একটু নীচে নামলেই চোখে পড়বে "অস্তেরিয়া দেই কাচ্চি তোরি" লেখা সাইনবোর্ড। এখানেই আমি দক্ষিণ হস্তের কাজটা সেরে নিই। একটা পিস্তল আর কিছু গুলি দেয়া হয়েছিল আমায়। এছাড়া ছিল একটা গাদা বন্দুক। ওটা নিয়ে আমি কখনো কখনো পাহাড়ে চলে যেতুম শিকারের উদ্দেশ্যে। জায়গাটায় আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না আর রাত্তিরে টহল দেওয়া ছাড়া কাজকর্ম কিছুই ছিল না।

চার মাস কাটিয়ে দিলাম। একই ভাবে এখানে দিনগুলি কেটে যায়। একদিন সন্ধ্যে বেলায় শুনি দোরে টোকার আওয়াজ। ভাবলাম কোম্পানীর কেউ এসেছেন হয়ত। কিন্তু দরজা খুলে দেখি দুজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক

দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে একজনকে আমি ভালভাবেই চিনি। ওর নাম রিনাল্‌দি—লরি চালায়। এর আগে যে গুদামটায় কাজ করতুম সেখানে ও-ই একমাত্র আমার চশমা আর গলার স্বর নিয়ে কখনো ঠাট্টা করেনি। আমি যেমনটা ও ঠিক তার বিপরীত। আমায় চামাড়ের মতন দেখতে আর ওকে দেখায় ভদ্রলোকের মত। তাছাড়া ওর সুপুরুষ চেহারা, লম্বা মজবুত গড়ণ। আর আমি তো কুচ্ছিত দেখতে। মেয়েদের কাছে আমি মোটেও অকর্ষনীয় নই। আর ও চাইলেই হয়, কত মেয়ে চাই? এসব কারণেও হয়ত (অর্থাৎ যেহেতু ওর সঙ্গে আমার কোনো মিলই ছিল না আর আমার ইচ্ছেটা হয়ত ছিল ও যেমনটা তেমন হয়ে ওঠা) রিনাল্‌দিকে বেশ পছন্দ করতাম আমি। ওর সঙ্গের মেয়েটার নাম এমিলিয়া। ছোটখাট গোলগাল চেহারা, একটু লম্বাটে ফ্যাকাশে মুখ আর বড় বড় একজোড়া হালকা ধুসর চোখ। ওর ঠোঁটের ধার দুটো এমনভাবে একটু উঠে আছে যে মনে হয় যেন হাসছে।

দ্বিতীয় লোকটা মন্তেরেতেন্দ্রোর লোক, নাম তেওদরো। লোকটার লাল কোঁকড়ানো চুল, বেড়াল চোখ, ছুঁচলো নাক এবং লালচে গাল—মনে হবে যেন ঈশান কোণের ঝোড়ো হাওয়া সর্বক্ষণ ওর মুখের ওপর দিয়ে বইছে। রিনাল্‌দি জানাল ওর কিছু বলার আছে আমাকে। ঘরে নিয়ে এলাম ওকে। একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'ভিনসেনজো কোনো ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে কিছু পয়সা কামাবার মওকা এসে গেছে তোমার·· অবিশ্যি কেয়ারটেকার পদে আছো বলেই সেটা সম্ভব হচ্ছে।' আমি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমাকে নীরব দেখে বেশ উৎসাহের সঙ্গে ও বলে গেল ব্যাপারটা কি। শহরের একটা গুদাম থেকে বেশ কিছু মাল সরিয়েছে ওরা। আমার হেফাজতে যে কুটিরগুলো রয়েছে তার একটার মধ্যে চোরাই মালগুলো রাখতে দিতে হবে আমাকে! পরে সুযোগ বুঝে মালগুলো নেবার ব্যবস্থা করবে ওরা। আর তখন আমার হাতেও কিছু গুঁজে দিয়ে যাবে।

শুনে তো আমি থ। কিন্তু না বলতে পারলাম না। রিনাল্‌দিকে ভাইয়ের মত দেখতাম। আমতা আমতা করে বললাম: "শোন ভাই রিনাল্‌দি, আমি তো এখানকার কেয়ারটেকার। তাই নয় কি?" "কেয়ারটেকার বই কি।" "বেশ, তাই যদি হয় তো আমার কেয়ারটেকারের কাজটা খোয়াতে আমি রাজী নই।" "তার মানে? বলতে চাইছো কী?" "বলতে এটাই চাইছি,

তোমাদের যা খুশী করতে পারো। মালপত্তর রেখে যেতে পারো, দরকার মত আসা-যাওয়া করতে পারো—কিন্তু আমি এসবের কিছুই জানি না, আমি তোমাদের দেখিনি, তোমাদের চিনি না—আর হঠাৎ যদি মালিকের লোক দেখে ফেলে তো বলতে হবে তোমরা আমায় চেনো না—অর্থাৎ কিনা মালগুলো রেখে গেছো আমার অজান্তে।" অবাক হয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ওরা। প্রায় শাসিয়ে তেওদরো বলল : "কিন্তু মালগুলোর ওপর নজর রাখা চাই, বুঝলে ? তুমি তো আবার আমাদের চেনো না—রিনাল্দি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল :" "তুমি ভিনসেঞ্জোকে চেনো না বলে ওকথা বলছো। ঘাবড়াবার কিছু নেই।"

আবার আমাকে বলতে হল : "এখানকার কেয়ারটেকার যখন আমি, তখন তোমাদের মালের কেয়ারটেকারও বটে।" "তেওদরো ফের আমার দিকে চেয়ে গর্জন করে উঠল :" "ভয় নেই, তোমার পাওনা তুমি পাবে।" "তোমারও ভয় নেই, বেশী মাথা ঘামবারও দরকার নেই" রেগেই বললাম : "তোমাদের কাছ থেকে কানাকড়িও চাই না আমি।" যাই হোক মিটমাট একটা হয়ে গেল। রিনাল্দি বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল একটা লরি নিয়ে। মালগুলো ওরা একটা ঘরে কয়েকটা পিপের আড়ালে রেখে গেল। আমি দেখিনি কিছুই। ওরাই বলল ওগুলো কাপড়চোপড়। যাবার আগে এমিলিয়া আমার দিকে একটা কটাক্ষ হেনে গেল। সেই চাউনিতে একটা সানুরাগ ভাব ফুটে উঠল। আমার ওটুকুই লাভ।

এরপর ওরা আরো তিন-চারবার এসেছিল। প্রতিবারই এমিলিয়া সঙ্গে ছিল। ওরা লরির হর্ণ বাজিয়ে জানান দিত আর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গেট খুলে দিতাম আমি। মাল খালাসের সময় দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম। ওই ত্যাঁদোর তেওদরোর সঙ্গে আমায় আরো খানিকটা কথা কাটাকাটি হল। বড্ড হম্বিতম্বি করে আমার সঙ্গে কথা বলত লোকটা। একদম বরদাস্ত হত না ওকে। তবে এমিলিয়া কিন্তু সবসময়ই হেসে দুটো মিষ্টি কথা কইত আমার সঙ্গে। একবার সে আমায় বলল : "এভাবে একা একা থাকেন, একঘেয়ে লাগে না ?" আমি বলেছিলাম : "একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।"

একদিন খবরকাগজ খুলে দেখি তেওদরো, রিনাল্দি এবং আরো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে। কাগজে ওদের "দেয়ালে গর্ত খুঁড়া দল" বলা হয়েছে

দেখলাম। কারণ পাশের ঘরের দেওয়ালে গর্ত খুঁড়ে ওরা নাকি দোকানে ঢুকত। কখনো কখনো আবার সেলার থেকেও আসত, তবে সবসময়ই গর্ত খুঁড়ে ওরা কাজ হাসিল করত। কাগজে রিনাল্‌দি ও তেওদরোর ছবি ছাপে। এছাড়া ছিল আরেকটি লোকের ছবি। কাগজের হেডলাইনে লেখা ছিল: "বিচারাধীন বিপজ্জনক অপরাধী দল। ড্রাইভার হিসেবে রিনাল্‌দির ভয়টা অন্যদের চেয়ে কমই ছিল। এমিলিয়া সম্পর্কে একটা কথাও ছিল না।

তখন শীতকাল। এক শীতের রাতে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বইছে একটানা হাওয়া। সামনের চত্বরটা হ্রদ হয়ে গেছে যেন। এমনি এক রাতে শুনলাম দরজায় টোকা। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি এমিলিয়া দাঁড়িয়ে। এ কী চেহারা হয়েছে ওর? গর্ভবতী হয়েছে এমিলিয়া। পেটটা বেশ ঢাউস হয়ে গিয়েছে। ওর ওই সুন্দর মুখ যেন নেমে আসছে পেটের দিকে। তাছাড়া বৃষ্টির জলে নেয়ে উঠেছে। জামাকাপড় ন্যাতার মতো হয়ে গেছে। চুল লেপটে আছে সারা মুখে। ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দে ও আমার হাতে বাড়িয়ে দিল রিনাল্‌দির লেখা একটা চিঠি। চিঠিতে লিখেছে, বছর খানেকের মধ্যেই সে ছাড়া পাচ্ছে। এই সময়টা আমি যেন এমিলিয়ার দেখাশোনা করি। এজন্যে কিছু টাকাকড়িও সে সঙ্গে দিচ্ছে। তাছাড়া ওর মালপত্তরগুলোর দিকেও যেন নজর রাখি সে কথাও লিখেছে। ওগুলো সবই নাকি রিনাল্‌দির—অন্যেরা বখরা সবাই পেয়ে গেছে। এই পর্যন্তই লিখেছে সে। সহসা আমার মনে হল, রিনাল্‌দি ধরেই নিয়েছে আমাকে দিয়ে সে যা খুশি তা করিয়ে নিতে পারবে। ধারণাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যেও নয়। কারণ মনে হত ওর জন্যে আমি সব কিছুই করতে পারি। এমিলিয়াকে বললাম, রাতটার মতো আমার বিছানায় শুয়ে পড়তে। আমি বালিশ নিয়ে পাশের ঘরের মেঝেতে শুয়েই রাতটা কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। এভাবেই সুরু হল আমাদের দুজনের একত্রে বসবাস।

এই ঘটনার মাস কয়েক কেটে যাবার পর কেউ ডিপোতে এলে নিশ্চয়ই ভাবত আমি বিয়ে-থা করেছি। একজন সুখী স্বামী এবং সুখী পিতা আমি। অক্টোবরের রোদ্দুরে আঙিনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমিলিয়া। ওর সুডৌল সুন্দর বাহুর ওপর হাতা গুটিয়ে আমার শার্ট ধুচ্ছিল, নিংড়ে নিচ্ছিল এমিলিয়া। দড়ির ওপর শুকোতে দিয়েছে অন্যান্য কাপড়চোপড়। আর ঘরের বাইরে

রোদ্দুরে বসে আমি বাহুতে ধরে রয়েছি এমিলিয়ার শিশুটিকে—যার নাম রাখা হয়েছে আমারই নামে 'ভিনসেঞ্জো'।' পাশের একটা ঘর থেকে, (যেটা আমি নিজে তৈরী করেছিলাম) ভেসে আসছিল রান্নার সুগন্ধ। এমিলিয়াই এখন আমাকে রেঁধে দিত, সরাইখানায় খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। আগেই বলেছি এখন কেউ এসে আমাদের দেখলে, অর্থাৎ আমি বাচ্চাকে খেলা দিচ্ছি আর এমিলিয়া কাপড় ধুতে ধুতে হাসিমুখে স্নিগ্ধভাবে কথা বলছে আমার সঙ্গে, নির্ঘাত ভাবত আমরা সুখী এক পরিবার। অথচ আসলে ব্যাপারটা তো মোটেও তা নয়। বাচ্চাটা রিনাল্দির, এমিলিয়া রিনাল্দির, লুকিয়ে রাখা মালপত্র রিনাল্দির। আমি আগের মতনই কোম্পানীর মালপত্রের কেয়ারটেকার মাত্র। এখন শুধু সেই সঙ্গে রিনাল্দির মালপত্রের এবং বউ আর বাচ্চার কেয়ারটেকারও বটে। এটুকু বাদ দিলে আমরা সত্যিই যেন এক দম্পতি। এমিলিয়া আমার কোনও অভাবই রাখত না। আর বাচ্চাটাও ছিল যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি সুন্দর ওর ব্যবহার। অসুবিধে ছিল শুধু একটাই। আমাকে সর্বদাই রিনাল্দির কথা বলতে হত এমিলিয়ার সঙ্গে। রিনাল্দির প্রতীক্ষায় প্রতিটি প্রহর কাটছিল এমিলিয়ার। এতে অবশ্য আমি মনে কিছু করতাম না। কোনও পুরুষের প্রেয়সী হওয়া এক জিনিস, যেমন এমিলিয়া ছিল রিনাল্দির। আর বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। আমার আর এমিলিয়ার মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব। তাছাড়া মনে হত রিনাল্দিই যেন দুনিয়ার একমাত্র পুরুষ। আমার কোন অস্তিত্বই নেই। একদিন সন্ধ্যেবেলা কথাটা এমিলিয়াকে বললাম। এই প্রথম আবিষ্কার করল যেন আমিও একটা পুরুষ মানুষ এমনভাবে সেদিন থেকেই আমার সঙ্গে এমিলিয়া প্রেম ভালবাসা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করে দিল। এমিলিয়া নিছক ঠাট্টা করছিল বই কিছু নয়। কিন্তু আমি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার কাছে এমিলিয়ার আকর্ষণ কত গভীর। শেষটায় একদিন আমি বলেই ফেললাম: "দ্যাখো, তুমি তো রিনাল্দির। তাই আমার কথা না হয় নাই ভাবলে" এমিলিয়া উত্তরে বলল: "রিনাল্দির আমি ঠিকই, কিন্তু তুমি তো খাঁটি বন্ধু। হিংসে করা উচিত নয় তোমার।" এখানেই এর পরিসমাপ্তি।

একদিন রাত্তিরে একটা আওয়াজ যেন কানে এল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। রিভলবারটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। পূর্ণিমা রাত।

চৌবাচ্চার জলে চাঁদটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রূপোর মত ঝকঝক করছে। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমন কি কোন্‌টা পাথর আর কোন্‌টা নুড়ি বুঝতে কষ্ট হয় না। ছায়া দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে চারদিকে কালো পাহাড়। দিবালোকের মতই সব কিছু স্পষ্ট। আর তক্ষুণি ওকে আমি দেখে ফেললাম। যেই দেখলাম লোকটা গা ঢাকা দেবার তালে আছে ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল: "পিস্তলটা নামাও। আমাকে চিনতে পারছো না?"

লোকটা আর কেউ নয়, তেওদরো। মস্তেরেন্দোর সেই লোকটা। কিন্তু আশ্চর্য রকম পালটে গেছে। পরনে ছেঁড়া জামা কাপড়, ভাঙা গাল ভরতি লালচে দাড়ি আর হলদে চোখ দুটো চেয়ে আছে যেন নেকড়ের মতো। তেওদরো বলল: "আমি মালপত্তরগুলো নিতে এসেছি। বাইরে আমার বন্ধুরা লরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" "কিন্তু মালগুলো তো রিনাল্‌দির।" আমি বললাম।

শুরু হল বাকবিতণ্ডা। প্রথমটায় ও আমাকে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করল, তারপর আধাআধি বখরার কথা পাড়ল। কিন্তু আমি সোজা না বলে দিলাম। আমার চৌবাচ্চাটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমিলিয়ার জানালায় একটা আলো। এমিলিয়া আমাকে লক্ষ্য করছিল। শেষকালে আমি বললাম: "দ্যাখো, ভালো চাও তো কেটে পড়ো।" "বেশ কেটেই পড়ছি," বলেই তেওদরো গেটের দিকে পা বাড়াল। পেছন পেছন আমিও চললাম। ওর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলছিলাম। কারণ আমি জানতাম ওর মত লোকেদের কাছে ছোরাছুরি থাকে। ঠিক তাই। গেটের কাছকাছি আসার ঠিক আগেই হঠাৎ ও লাফিয়ে পড়ল আমার দিকে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে আমি গুলি ছুঁড়লাম। এমন তাজ্জব কাণ্ড কখনো শুনেছেন? তেওদরো তখনো আমার দিকে এগোতে লাগল। এদিকে ওর চোখমুখ বেরিয়ে গেছে। এক হাতে বুকের গুলিবেঁধা জায়গাটা ধরে আছে আরেক হাতে ছুরিটা ধরা। আবার গুলি করলাম। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল তেওদরো।

পরদিন সকালে পুলিশ তদন্তে এল। দেখা গেল তেওদরো দাগী আসামী। জেল থেকে পালিয়েছে। সুতরাং সেখানেই মিটে গেল ব্যাপারটা। শুধু তাই নয়। কর্তব্য পরায়ণতার জন্য কোম্পানী আমাকে একটা উপহার পর্যন্ত পাঠিয়ে

দিল। এমিলিয়াকে বললাম: "এর আগেই তো রিনাল্‌দি আমাকে একটা চোর বানিয়েছে, এবার বানাল একটা খুনে।" "তা কেন? তুমি গুলি ছুঁড়েছ আত্মরক্ষা করতে। তার বেশী তো কিছুই বলার নেই এতে।" এমিলিয়া বলল। বললাম 'আমি এমনিই বলছিলাম। তাছাড়া আমি কেয়ারটেকার। দরকার হলে গুলি তো ছুঁড়তেই হবে।'

অবশেষে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রিনাল্‌দি যেদিন ওর বউ-বাচ্চা আর মালপত্তর নিয়ে যেতে এল, ঠিক সেদিনই কোম্পানী থেকে খবর এল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিপো তুলে নেওয়া হচ্ছে। অতএব, সব কিছুই পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে এল একই সঙ্গে। আর কারো কেয়ারটেকার হবার দরকার নেই আমার। না কোম্পানীর না রিনাল্‌দির। একদিন মাঝ রাত্তিরের পরে এল রিনাল্‌দি। সঙ্গে একটা লরি। লরির উইণ্ডস্ক্রীনে সাদা হরফে সে লিখে রেখেছে, "এমিলিয়া।" বললাম: "রিনাল্‌দি, এই নাও তোমার এমিলিয়া, যেমনটি এনেছিলে তেমনটিই রয়েছে···এই তোমার ছেলে···ঘরের ভেতরে তোমার মালপত্তর। দেখতেই পাচ্ছো, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।" রিনাল্‌দি হাসল। এমিলিয়া আর ছেলেকে কাছে পেয়ে সে বে সুখী হয়েছে সেটা বোঝা যায়। বলল: "তুমি ঠিকই বলেছ ভিন্‌সেঞ্জো·· আমি জানতাম তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি—সত্যি খুব ভালো লাগছে।" আমার মনে তখন রাগ আর দুঃখ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আবার বললাম: "রিনাল্‌দি, যা কিছু আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলে, সেই সমস্ত কিছুই যেমনটি ছিল তেমনটিই তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।" তখন সে আমাকে টাকা দিতে চাইল। একটা ঘড়ি উপহার হিসেবে নেবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করল। লরিতে করে রোমে নিয়ে যাবার কথা বলল। সমস্ত কিছুই আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম: "আমার কিছুরই দরকার নেই—আমি কেয়ারটেকার, তাই না?" এখন আমার মনে কোন সন্দেহই রইল না যে মনে মনে এমিলিয়াকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। ওর সম্মান রেখে চলেছিলাম বলে দুঃখও হল, আনন্দও। আমি নিজের হাতে মাল তুলে দিলাম লরিতে রিনাল্‌দি মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল: "শিগগিরই আবার দেখা হবে, চলি মিঃ কেয়ারটেকার?" ওর কথায় কিন্তু কোনও বিদ্বেষভাব ছিল না। লরিটা নড়ে উঠল।

দিনকয় বাদে কোম্পানীর লরি এল। কোম্পানীর লোক ইট, সিমেন্ট, পাইপ, আলকাতরার পিপে সব কিছু লরিতে তুলে নিল। এরপর চারদিকের দেয়াল ভেঙে ফেলে সেই ইটগুলিও নিয়ে গেল। সবশেষে নজর পড়ল কুঁড়েঘরগুলির দিকে। কাঠের তক্তাগুলি তুলে নেওয়া হল। বেশ কয়েকদিন সারাটা দিন ধরে লরিগুলো এল আর রাজ্যের ধুলো উড়িয়ে মাল বোঝাই করে চলে গেল। একেবারে শেষমেশ আমার ঘরটাও একদিন সকালবেলা ভেঙে ফেলে তুলে নিয়ে পাততাড়ি গোটানো হল। একমাত্র আমিই রইলাম পড়ে। এখন। যতদূর চোখ যায় শুধু ধূ ধূ করে সমতল ভূমি। ঘাস গজিয়ে উঠছে এর মধ্যেই, এখানে সেখানে পড়ে আছে ইটের টুকরো, বয়ে যাচ্ছে সরু সরু জলধারা আর চতুর্দিকে পাহাড় আর পাহাড়। দুবছর কেটে গেল এ জায়গাটায়। এবার বিদায় নেবার পালা। আমার যাবতীয় জিনিসপত্র একটা স্যুটকেসে পুরে সাইকেলের পেছনটায় বেঁধে নিলাম। সাইকেল রাস্তায় নামিয়ে হেঁটে এগিয়ে চললাম ভিয়া স্যালারিয়ার দিকে। বড় রাস্তায় এসে সাইকেলে চেপে বসলাম। ধীরে ধীরে সাইকেল চালাতে লাগলাম রোমের দিকে।

□ বেশী তলিয়ে দেখতে যেয়ো না □

একেবারে কোন কিছু না বলে অ্যাগনেস ওভাবে চলে না গেলেই পারত। এমন কি "জাহান্নামে যাও-টাও" গোছের কিছু একটা বলে গেলেও তো পারত। অবিশ্যি আমিও কিছু ধোয়া-তুলসী নই। কিন্তু ও যে ঠিক কি চায় সে কথাটা তো খুলে বললেই হত। আমাদের দু বছরের বিবাহিত জীবনে অমন ধারার একটা কথাও কখনো সে বলেনি। আমার এক মুহূর্তের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিনা একদিন সে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল। যেন একটা ঝি ভাল কাজ পেয়ে চলে যাচ্ছে এমনি ভাবে! আজ ছ মাস অ্যাগনেস চলে গেছে। কিন্তু কেন যে চলে গেল সে কথা আজও আমার কাছে এক মস্ত হেঁয়ালি।

সেদিন সকালে কাছাকাছি ছোট বাজারটাতে সংসারের কেনাকাটা সেরে (আমি আবার কেনাকাটা নিজেই করতে ভালবাসি। কারণ আমি জানি কোনটার কত দাম, কোন জিনিসটা আমার পছন্দ। তাছাড়া দরাদরি বাছা-বাছি করতে আমার ভালোই লাগে। যে মাংস যে ফল খাই তা ভাল কিনা খুঁটিয়ে দেখে তবেই নিই।) ফের বেরিয়েছিলাম খাবার ঘরের পর্দার পাড়ের গজ দেড়েক কাপড় কিনে আনতে। পয়সা খরচ করি রয়েসয়ে, তাই অনেক ঘুরলাম। শেষকালে পেয়ে গেলাম ভিয়া দ্যেল উমিল্‌তার ছোট একটা দোকানে ঠিক যেমনটি চাই তেমনটি। ঘরে যখন ফিরলাম বেলা তখন এগারোটা বেজে কুড়ি। সোজা চলে এলাম খাবার ঘরে পর্দার রঙের সঙ্গে পাড়ের রঙটা মিলিয়ে নিতে। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপর কালির দোয়াত, কলম আর একটা চিঠি। সত্যি বলতে কি, সবার আগে চোখে জলজল করে উঠল টেবিল ঢাকনার ওপরে একটা কালির দাগ। ভাবলাম, কি বিচ্ছিরি, অ্যাগনেস এত আগোছালো কেন?—কালির এই দাগটা নিশ্চয়ই ওরই কীর্তি।' দোয়াত, কলম, চিঠি সব সরিয়ে ফেললাম। টেবিল ঢাকনাটা নিয়ে চলে এলাম রান্না-ঘরে। একটা লেবু দিয়ে আচ্ছা করে ঘষে তুলে ফেললাম দাগটা এরপর ঢাকনাটা ঠিক জায়গায় রেখে তবে সুস্থির হলাম। আর তখনই খেয়াল হল চিঠিটার কথা। চিঠির ওপর আমার নাম লেখা ছিল: অ্যালফ্রেডো।

চিঠিটার ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলাম 'ঘরের কাজকর্ম সেরে রেখে গেলাম। রান্নাটা নিজেই করে নিও—ওটাতো বেশ ভালোই পারো তুমি। চললুম। মায়ের কাছেই ফিরে যাচ্ছি। অ্যাগনেস। খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। চিঠিটা ফের পড়লুম। ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকল যে অ্যাগনেস আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের দু বছরের বিবাহিত জীবনের বাঁধন কেটে চলে গেছে। অভ্যাসবশে চিঠিটা সেই দেরাজে রাখলাম যেখানে আমি রসিদ কাগজ-পত্র রাখি। চেয়ার টেনে বসলাম জানালার পাশে। ভেবে পেলাম না কি করবো না-করবো। ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটে গেল যে বিশ্বাস হতে চায় না। এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একসময় নজরে পড়ল মেঝেয় একটা পালক পড়ে আছে। বুঝলুম অ্যাগনেসেরই কাণ্ড। ঘর ঝাঁট দেবার সময় ঝাড়ু থেকে বেরিয়ে এসেছে। পালকটা তুলে জানালা খুলে বাইরে ফেলে দিলাম। টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম অ্যাগনেসের কথা। কেন ও আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল? যেন ইচ্ছে করে আমায় আঘাত করতে চায়। কথাটার উত্তর খুঁজছিলাম নিজের মনে। ভাবছিলাম আর হাঁটছিলাম। আমার হাঁটায় একটু বিশেষত্ব আছে। একটা পাথর ছেড়ে ছেড়ে হাঁটি। প্রথমে ভেবে দেখলাম, ওর প্রতি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছি বলে অ্যাগনেস মনে করে কিনা। কিন্তু না, সেরকম তো কিছুই হয়নি। মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল আমার কোনকালেই ছিল না। আমাকেও ওরা বুঝতে পারে না! আমিও ওদের বিশেষ বুঝিটুঝি না। আর তাছাড়া বিয়ে করার পর থেকে তো বলতে গেলে মেয়েদের নিয়ে বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাইনি। অ্যাগনেস কিন্তু নিজেই আমাকে থেকে থেকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করে তুলত: 'আচ্ছা, তুমি যদি অন্য মেয়ের প্রেমে পড়ো তো কি করবে বলো তো?' আমি বলতাম: 'সে অসম্ভব। আমি তোমাকেই ভালোবাসি। আর সেই ভালোবাসা রইবে সারা জীবন ধরে।" এসব কথা যখন আবার ভাবি তখন মনে পড়ে ওই' "সারা জীবন ধরে" কথাটা শুনে অ্যাগনেস কিন্তু মোটেই খুশী হতে না। বরঞ্চ ওর মুখটা ভার হয়ে উঠত। কেমন চুপ মেরে যেত। আচ্ছা, ভালোবাসার ব্যাপার যদি না হয় তবে আর কী হতে পাবে? টাকা পয়সার ব্যাপারে কিছু কি? নাকি আমার ব্যবহারে কোনও ত্রুটি ছিল? কিন্তু না, এসব কোনও

কারণই তো ঘটেনি। অবিশ্যি একথা সত্যি যে বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ওর হাতে আমি টাকাকড়ি দিইনি। তার দরকারই বা কী ছিল? যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। আর ব্যবহারের কথা? সে কথায় আর কাজ কী? তাতে যে কোনও খুঁত ছিল না, তা তো আপনারা নিজেরাই দেখতে পারেন। হপ্তায় দুটি করে সিনেমা, দুবার করে কাফেতে যাওয়া, প্রতি মাসে দুই করে সচিত্র সাময়িকী, প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ, শীতকালে ফাউ অপেরা, গরম-কালে মারিনোয় গ্রীষ্মাবকাশ যাপন। এ তো গেল আমোদ-প্রমোদের কথা। পোশাক-আশাকের কথাই যদি বলেন তো সে ব্যাপারে ওর কোন অভিযোগই থাকার কথা নয়। যখনই ওর যা দরকার হয়েছে—তা সে ব্রেসিয়ারেই হোক, কিংবা মোজা কি রুমাল—তক্ষুণি সেটা কিনে দিতে কসুর করিনি। ওর সঙ্গে দোকানে গেছি। জিনিস বাছাইয়ে সাহায্য করেছি, দাম মিটিয়ে দিয়েছি নিঃশব্দে। যখনি ও পোশাক বা টুপির কথা বলেছে তখনি ওর সঙ্গে দোকানে যেতে চেয়েছি। বরঞ্চ বলতে হবে অ্যাগনেসই বিশেষ চাইত-টাইত না—বিয়ের বছরখানেক পর থেকে ও কোন কিছু চাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল। আমাকেই বরং মনে করিয়ে দিত ওর এটা-ওটা চাই। জবাবে ও বলত, গেল বছরের জিনিসেই ওর দিব্যি চলে যাবে—নতুন পোশাকের দরকার নেই। সব দেখেশুনে আমার এ ধারণাই হত যে এসব ব্যাপারে ও অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা। সাজগোজের দিকে ওর মন নেই।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা হৃদয়-ঘটিত বা টাকা-জনিত নয়। ব্যাপারটা আসলে উকিলরা যাকে বলেন, "মেজাজের অসঙ্গতি" তাই! আমি তখন নিজেই নিজেকে শুধোলাম, কি মেজাজের অসঙ্গতি থাকতে পারে আমাদের দুজনার মধ্যে—আমরা যারা একদিনের জন্যেও ঝগড়া করিনি এই দু'বছরের মধ্যে? আমরা তো একসঙ্গেই থেকেছি। মেজাজ যদি আমাদের আলাদাই হবে, তবে এতদিনে তা নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। কিন্তু অ্যাগনেস তো একবারও আমার কোন কথার প্রতিবাদ করেনি। বলতে গেলে কথাই বড় একটা বলত না। ঘরে বা কাফেতে কয়েকটি যে সন্ধ্যে আমরা সকসঙ্গে কাটিয়েছি সেখানেও প্রায় মুখই খুলত না সে। কথা অবিশ্যি সারাক্ষণ আমিই চালাতাম। স্বীকার না করে উপায় নেই, কথা বলতে আমি খুবই ভালবাসি এবং আমার কথা লোকে শুনুক এটা আমি চাই। বিশেষ করে যার সঙ্গে সম্পর্ক আমার

স্বনিষ্ঠ এমন লোকের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন তো আরো বেশি। আমার কথা বলার ধরণ ধীরস্থির, একই ভঙ্গিতে আমি কথা বলি, তাতে খুব বেশী ওঠাপড়া থাকে না। বেশ যুক্তিনিষ্ঠভাবে অনর্গল কথা বলে যাই। একটা বিষয়কে যখন ধরি তখন তার শেষ পর্যন্ত দেখে তবে ছাড়ি। আর সাধারণত ঘরোয়া বিষয়ে নিয়েই কথা বলতে আমি ভালবাসি। জিনিসপত্রের দাম নিয়ে আলোচনা, আসবাবপত্র সাজানো-গোছানো, রান্নাবান্না এ ধরণের যে-কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। এসব বিষয়ে কথা বলতে আমি এতটুকু ক্লান্তিবোধ করি না। একই বিষয় নিয়ে হয়ত বার বার একই কথা বলে যাই। আর বলুন তো, মেয়েদের সঙ্গে এছাড়া আর কী কথাই বা বলা যায়? অ্যাগনেস বেশ মনোযোগ দিয়েই আমার কথা শুনত—অন্তত আমার তো তাই মনে হত। একবার শুধু দেখেছিলাম যখন আমি ওকে ইলেকট্রিক ওয়াটার-হীটার কেমন করে কাজ করে বোঝাচ্ছিলাম ও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে জাগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: "কী গো, ভাল লাগছে না শুনতে?" সঙ্গে সঙ্গে ও জবাব দিয়েছিল: "না না, মোটেই তা নয়। কাল রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হয়নি কিনা তাই ক্লান্তি লাগছিল।"

স্বামীদের সাধারণত কী হয়? হয় অফিস কাছারি, নয় দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর নয়ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমার ক্ষেত্রে আমার অফিস বলুন, দোকান বলুন, বন্ধু বলুন সব কিছুই ছিল অ্যাগনেস। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করিনি ওকে। সর্বক্ষণ কাছে কাছে থেকেছি এমন কি শুনলে হয়ত অবাক হবেন—রান্নাবান্নার সময়েও কাছ ছাড়া হইনি। রান্নার ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। প্রত্যেকদিন খাবার সময় অ্যাপ্রণ গায়ে চড়িয়ে অ্যাগনেসকে সাহায্য করেছি। আর করিনি কী? আলুর খোসা ছাড়িয়েছি, ফ্রেঞ্চবীম ফালি করে কেটে দিয়েছি, পুর বনিয়েছি, মায় সস্‌প্যানের দিকেও নজর রেখেছি। ওর কাজে এত সাহায্য করেছি যে ও প্রায়ই বলত: "রান্নাটা তুমিই করে নাও। আমার বড্ডো মাথা ধরেছে। আমি একটু শোব।" রান্নাটা তখন আমিই সেরে নিয়েছি, এমন কি "রন্ধন সহায়িকা" পড়ে নতুন নতুন খাবার তৈরী করেছি। মুশকিল হল, অ্যাগনেস নিজেই বড় খেতে-টেতে চাইত না। হালে তো খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। একবার ও আমায় বলেছিল, বলাই বাহুল্য ঠাট্টা করে: 'আসলে তুমি একটি মেয়ে—

বাড়ীর গিন্নি।' মানতেই হবে কথাটায় সত্য খানিকটা ছিল বই কি। কারণ রান্নাবান্না ছাড়াও কাপড়-চোপড় ধুতে, ইস্ত্রি করতে, সেলাই করতে আমি ভালবাসি। এমন কি অবসর সময়ে রুমালের ছেঁড়াফাটা সারিয়ে নিই। বলেছি তো, ওকে একা রেখে কোথাও যাইনি। এমন কি যখন ওর কোন বান্ধবী এসেছে বা ওর মা এসেছেন দেখা করতে তখনো না। যখন অ্যাগনেসের মাথায় চাপল যে ও ইংরেজি শিখবে তখনো ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য আমিও ওই দুরূহ ভাষায় দুরস্ত হবার সাধনায় লেগে গিয়েছি। এত নিবিড়ভাবে নিজেকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলাম যে অনেক সময় এজন্যে লজ্জায়ও পড়তে হয়েছে। যেমন একবার একটা কাফেতে নীচু গলায় ও কি যেন আমাকে বলেছিল। কথাটা ধরতে না পেরে ওর পেছনে পেছনে ল্যাভেটরি অবধি ধাওয়া করেছিলাম আমি। দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে থাকে সে আমার পথ আটকে বললে ওটা মহিলাদের জন্যে—আমার যাওয়া চলবে না। এখন বলুন ত, আমার মত স্বামী কি পথে ঘাটে মেলে? প্রায়ই ও বলত: "আমি অমুক জায়গার যাচ্ছি, অমুকের সঙ্গে দেখা করতে। তোমার মোটেই ভাল লাগবে না ওখানে যেতে।" কিন্তু আমি জবাব দিতাম: "তা হোক, আমি আসছি তোমার সঙ্গে। হাতে তো বিশেষ কাজ নেই।" তার উত্তরে অ্যাগনেস বলত: "আসতে চাও এসো। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, তোমার একটুও ভাল লাগবে না।" আমার কিন্তু মোটেই খারাপ লাগত না। পরে আমি ওকে বলতাম: "দেখলে ত, একটুও খারাপ লাগেনি আমার।" সত্যি করেই আমরা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

এসব কথা মনে পড়ছিল আর অবাক হয়ে ভাবছিলাম অ্যাগনেস আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? ভাবতে ভাবতে কখন এসে পড়লাম বাবার দোকানে। বাবার দোকানটা পিয়াজ্জা মিনার্ভার কাছাকাছি জায়গায়। দোকানে বিক্রি হয় পবিত্র ধর্মীয় জিনিসপত্র! আমার বাবাকে এখনো যুবক বলা যায়। কোঁকড়া কালো চুল, কালো গোঁফ, আর সেই গোঁফের তলায় এমন একটি হাসি ফুটে ওঠে যার মানে আজো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। যাজক-টাজক আর ধর্মভীরু লোকেদের নিয়ে কারবার করতে করতেই হয়ত বাবার স্বাভাবিক অতিশয় শান্ত আর ব্যবহারটি নম্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার মা বলেন—যিনি আমার বাবাকে ভালভাবেই জানেন—বাবার তেজবীর্য ভেতরে লুকনো

আছে। যা হোক যাজকদের উত্তরীয় বস্ত্র ও পবিত্র পাত্র রাখা কাঁচের আলমারি পেরিয়ে সোজা দোকানের পেছন দিককার ঘরটায় গিয়ে হাজির হলাম। বাবাই ওখানে বসে কাজ করেন। যথারীতি তিনি হিসেব মেলাচ্ছিলেন আর গোঁফ চিবুতে চিবুতে ভাবছিলেন। আমি প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে বললাম: "বাবা, অ্যাগনেস আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

বাবা মুখ তুলে তাকালেন। গোঁফের তলাকার হাসিটি ঝিলিক দিয়ে উঠল। এমনও হতে পারে আমারই হয়ত মনের ভুল। তিনি বললেন: "শুনে দুঃখিত হলাম। সত্যি খুব দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কেমন করে?"

সবই খুলে বললাম। সবশেষে বললাম: "এতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন ও আমায় ছেড়ে চলে গেল।"

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বাবা বললেন: "কেন গেল তুমি কিছুই বুঝলে না?"

"না তো।"

খানিকক্ষণ নীরবে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন: "অ্যালফ্রেডো, তোমাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব বুঝছি না বলে আমি দুঃখিত··· তুমি আমার ছেলে, তোমাকে ভরণপোষণ করি আর ভালোবাসি যথেষ্ট···কিন্তু তোমার স্ত্রী—সে তো তোমারই ব্যাপার।"

"ঠিক কথা। কিন্তু কেন ও আমায় ছেড়ে চলে গেল?"

বাবা মাথা নাড়লেন। "আমি যদি তুমি হতাম তো বেশি তলিয়ে দেখতে যেতাম না। ছেড়ে দাও না···তাছাড়া জানা না-জানায় কি এসে যায়?"

"আমার কাছে অনেকখানি এসে যায়। অন্য যে কোন জিনিসের চেয়ে বেশি এসে যায়।"

সেই মুহূর্তে দুটি যাজক এসে হাজির হল। বাবা উঠে যেতে যেতে আমায় বললেন: "পরে দেখা কোর আমার সঙ্গে। তখন কথা বলা যাবে। এখন আমি একটু ব্যস্ত।" বুঝলাম এর বেশি ও'র কাছে প্রত্যাশা করা বৃথা। বেরিয়ে এলাম।

অ্যাগনেসের বাড়ি কাছেই—কোরগে ভিত্তোরিয়ায়। ভেবে দেখলাম, অ্যাগনেসই একমাত্র ওর চলে যাওয়ার রহস্যটা খোলসা করতে পারো, আর

কেউ নয়। তাই ওখানেই গেলাম। এক ছুটে দোতলায় উঠে এলাম। বসার ঘরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু অ্যাগনেসের বদলে ঘরে ঢুকল অ্যাগনেসের মা। ইনিও একটি দোকানের মালিক। ভদ্রমহিলাকে আমার একদম বরদাস্ত হয় না। ওঁর ওই রঙ-করা কালো চুল, টকটকে লাল গাল, হাসিমাখা ধূর্তামিভরা ধরণধারণ আমার অসহ্য ঠেকে। ভদ্রমহিলার পরনে ছিল ড্রেসিং গাউন, বুকে একটি গোলাপ। আমায় দেখতে পেয়ে ভদ্রমহিলা কৃত্রিম অন্তরঙ্গতার স্বরে বলে উঠলেন: "কী ব্যাপার অ্যালফ্রেডো, কি মনে করে?"

"সে তো আপনি ভাল করেই জানেন। অ্যাগনেস আমাকে ছেড়ে চলে এসেছে।"

"হ্যাঁ, সে এখানেই আছে।" ভদ্রমহিলা শান্ত গলায় বললেন। "কিন্তু এ ব্যাপারে কি করা যাবে বল ত? এসব তো ঘটেই থাকে।"

"এই কি আপনার শেষ কথা?"

আমার কথা শুনে তিনি খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন। তারপর বললেন: "তোমার বাবা-মাকে জানিয়েছ এ কথা?"

"হ্যাঁ, বাবাকে জানিয়েছি।"

"তিনি শুনে কি বললেন?"

আমার বাবা কি বললেন না-বললেন সেকথা শুনে ওঁর লাভ? অনিচ্ছায় জবাব দিলাম: "আপনি আমার বাবাকে তো চেনেন·· তিনি শুধু বললেন বেশী তলিয়ে যেন দেখতে না যাই।"

"ঠিক কথাই তিনি বলেছেন বাছা। বেশী তলিয়ে দেখতে যেয়ো না।"

আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠলাম: "কিন্তু কেন, কেন ও আমায় ছেড়ে চলে এলো? কি করেছি আমি ওর? সেকথা কেন বলছেন না?"

রেগেমেগে কথাগুলো যখন বলছিলাম সেই সময় আমার চোখ গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। টেবিলটা ঢাকা ছিল একটা কাপড়ে: সেই টেবিল ঢাকনার মাঝখানটায় একটা শাদা এমব্রয়ডারি-করা সেণ্টার-পীসের ওপর বসানো ছিল লাল কারনেশন ভরতি একটা ফুলদানি। কিন্তু দেখলাম সেণ্টার-পীসটা ঠিক জায়গায় নেই। নিজেরই অজান্তে কখন আমি ফুলদানিটা তুলে সেণ্টার পাসের জায়গায় বসিয়ে দিলাম। ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিট

হাসছিলেন। আমার কথার জবাব দিলেন না। শেষে বললেন : "বাঃ বেশ হয়েছে। সেণ্টার পীসটা এখন ঠিক মধ্যিখানটায় বসেছে। আমার নজরে ওটা পড়েনি। কিন্তু তোমার চোখ এড়ায় নি। বাঃ খাসা হয়েছে। তাহলে তুমি এখন এসো বাছা।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমিও ততক্ষণে উঠে পড়েছি। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে অ্যাগনেসের সঙ্গে দেখা হতে পারে কিনা। কিন্তু ভয় হল দেখা হলে হয়ত মাথা ঠিক রাখতে পারব না। নেহাত গোঁয়ারের মত কিছু বলে টলে বা কিছু একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসব। তাই সুড় সুড় করে ফিরে চলে এলাম। আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত স্ত্রীর মুখদর্শন করিনি। হয়ত একদিন অ্যাগনেস ফিরে আসবে, যখন দেখবে আমার মত স্বামী পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘরে ঢোকবার আগে ওকে একথা বলতেই হবে, কেন ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

□ বাড়াবাড়ি □

পিয়াজ্জো মেলোজ্জো দ্য ফরলির ইউক্যালিপ্টাস গাছের ছায়ায় শুকিয়ে-যাওয়া ফোয়ারাটার কাছে জুলাই মাসের এক সকালবেলায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিলুম। এমন সময় দুটি পুরুষ আর একটি স্ত্রীলোক এসে ওদের লিডো দ্য ল্যাভিনিওয় পৌঁছে দিতে বলল। ভাড়া নিয়ে দর-কষাকষি করতে করতে আমি ওদের ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। পুরুষ দুটির একটির লম্বা মোটাসোটা চেহারা। মাথায় পরিষ্কার চুল, বিবর্ণ মুখ, নীল চীনেমাটির বাসনের টুকরোর মত দুটি কোটরে বসা চোখ। বয়েস বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। অন্য পুরুষটি ছোকরা বয়েসী, গায়ের রঙ চাপা, মাথার চুল উশকো খুশকো, চোখে শেলের চশমা। পাতলা চেহারা, মুখের ভাব কেমন উদাসীন, ছাত্রটাত্র বলে মনে হয়। স্ত্রীলোকটি ভীষণ রোগা। দুই থাক আলগা চুলের মাঝখানে ধারালো লম্বা মুখ। আঁটো-সাঁটো সবুজ পোশাকে সরু শরীরটা সাপের মত দেখাচ্ছিল। সরস লাল ঠোঁট ফলের মত আর সুন্দর চোখদুটি ভেজা কয়লার মত চকচকে কালো। এমনভাবে তাকাল মেয়েটা আমার দিকে যে আমি কাজটা না নিয়ে পারলুম না। শুধু তাই নয়, তারা যে ভাড়া বলল তাতেই রাজী হয়ে গেলুম। গাড়িতে চাপল ওরা। ফরসা লোকটা বসল আমার পাশে, আর বাকী দুজন পেছনে।

আমি রোমের আড়াআড়ি গাড়ি চালিয়ে দিলুম। ব্যাসিলিকায় গাড়ি থামিয়ে পেট্রল ভরে নিলাম। তারপর ফের সেই রাস্তা ধরে বেশ জোরে চালিয়ে দিলাম গাড়ি। হিসেব করে দেখলাম দূরত্বটা পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতন হবে। এখন সাড়ে নয়টা বাজে, অ্যানজ্জিও পৌঁছতে-পৌঁছতে আন্দাজ এগারোটা হবে। সমুদ্রে স্নান করবার পক্ষে চমৎকার সময়। মেয়েটাকে বেশ চটকদার মনে হল। ওর সঙ্গে ভাব জমাবার কথা ভাবছিলুম মনে মনে। পুরুষ দুটির উচ্চারণে বিদেশী টান আছে। মনে হয় উদ্বাস্তু। রোমের আশপাশের ক্যাম্পে যারা বাস করে। তাদের মত মেয়েটা কিন্তু ইতালিয়, বা বলা যায় রোম শহরেরই মেয়ে। ওর মধ্যেও আভিজাত্যের ভাব বড় একটা ছিল না। ঝি টি বা ধোপাখানায় কাজ করে ওই গোছের মেয়ে

বলেই মনে হল। এইসব সাতপাঁচ ভাবছি, এদিকে কানও খোলা রেখেছি। কানে এলো, গাড়ির পেছনের সীটটায় মেয়েটা আর ছোকরাটা বকবক করছে আর হাসছে। মেয়েটাই হাসছিল বেশী। মেয়েটা যে নোংরা-গোছের মেয়ে-ছেলে সেটা লক্ষ করেছিলাম। মেয়েটাকে মাতাল ছোট্ট একটা সাপ বলে মনে হয়। ওদের হো-হো হাসি শুনে ফরসাপানা লোকটা কালো সানগ্লাসের তলায় নাকটা কোঁচকাল। মুখে কিছু বলল না বা ফিরেও তাকাল না। অবিশ্যি কারণও ছিল। চোখটা তুলে একবার উইণ্ডস্ক্রীনের ছোট্ট আরশিটার দিকে তাকিয়েই সে দেখতে পাচ্ছিল পেছনে কি হচ্ছে না-হচ্ছে। আমরা ট্রাপিষ্ট মঠ পেরিয়ে গেলাম। না-থেমে একেবারে অ্যানজিও ফর্ক অবধি চলে এলাম। গাড়ির গতি এখানে কমিয়ে আনলাম। পাশের ফরসা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম ঠিক কোন জায়গায় ওরা যেতে চায়। জবাব এলো: 'যেখানে লোকজন নেই এমন কোন নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে চলো। আমরা একা থাকতে চাই।' বললাম: 'এখানটায় তিরিশ কিলোমিটার জুড়ে জনমনিষ্যিহীন সমুদ্রতীর পড়ে আছে। এখন কি করবেন না-করবেন সেটা নিজেরাই ঠিক করুন।' পেছন থেকে মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল: 'না-না, ওই ঠিক করুক।' 'আমি কি ঠিক করবো?' আমি বলে উঠলাম। কিন্তু মেয়েটা সমানে চেঁচিয়ে চলেছে: 'না-না ওই ঠিক করুক।' যেন খুব মজা পেয়েছে এমনভাবে হেসে উঠল মেয়েটা। আমি তখন বললাম: 'লিদো স্থ ল্যাভিনিও লোকে গিসগিস করছে। কাজেই এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে লোকজনের কোনো চিহ্ন নেই।' আমার এই কথা শুনে মেয়েটা ফের হাসতে শুরু করল। পেছন থেকে আমার কাঁধ চাপড়ে বলে উঠল: 'বাঃ বাঃ খাসা হবে। ভারি চালাক লোক তো তুমি। আমরা কি চাই ঠিক বুঝে গেছো।' মেয়েটার এই ব্যবহারের কি যে মানে করা উচিত ভেবে পেলাম না। বিরক্ত যেমন লাগছিল, মনে মনে আশাও জাগছিল। ফরসা লোকটা মুখ বেজার করে বসেছিল। শেষে রা কাড়ল: 'পিনা এর মধ্যে এত হাসবার কি আছে?' আমরা আবার রওনা দিলাম।

'বেজায় গুমোট গরম পড়েছিল। রাস্তা থেকে কড়া একটা আলো ঠিকরে আসছিল। পেছনে দুটিতে মিলে তেমনি অনর্গল বকে চলেছে আর হাসছে। মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ চুপ মেরে যাচ্ছে। ফরসা লোকটা উইণ্ডস্ক্রীনের

আরশিতে কিছু দেখতে পেয়ে নাকটা কোঁচকাচ্ছিল। বোঝা গেল ব্যাপারটা ওর মনঃপূত হচ্ছে না। রাস্তার একধারে শুকনো ন্যাড়া মাঠ অন্যধারে ঝোপঝাড়। এক জায়গায় এসে অভয়ারণ্যের নোটিশ বোর্ড ঝোলানো দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে একটা সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরলাম। শীতকালে ওখানটাতে আমি বন্দুক চালিয়েছি। তাই জানা ছিল জায়গাটা জনমানব-বিবর্জিত। ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে পাইনবন, পাইনবন পেরিয়ে তীরভূমি, এরপর সমুদ্র। আমি জানতাম আমেরিকানরা অ্যানজিওতে অবতরণকালে পাইনবনে একটা বীচ-হেড তৈরী করেছিল। ট্রেঞ্চ তখনো ছিল, ছিল বেশ কিছু জংধরা টিন আর খালি বাক্স। মাইনের ভয়ে কেউ ও তল্লাট মাড়াত না। কড়া রোদ্দুরে ঝোপঝাড় দেখাচ্ছে প্রায় সাদা। রাস্তা একদম নাক বরাবর। খানিকটা সাফ জায়গা পেরিয়ে ফের ঝোপঝাড়ে ঢুকে পড়ল গাড়িটা। পাইনগাছগুলি এখন চোখে পড়ছিল। পাইনের সবুজ পাতাগুলি হাওয়ায় যেন শূন্যে সাঁতার কাটছে। পাইনের লাল গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নিবিড় নীল ঝকমকে সমুদ্র। গাড়িটা ধীরে ধীরে চালাচ্ছি। ঝোপঝাড়ে পথ ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। সেজন্যে স্প্রীং কেটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। একমনে রাস্তা দেখে দেখে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশের ফরসা লোকটা শরীর দিয়ে অ্যায়সা জোরে ধাক্কা মারল যে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। 'হচ্ছেটা কি ?' ব্রেক কষে চেঁচিয়ে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পিঠে একটা খোঁচা টের পেলাম। উইণ্ডস্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আর বাক্যস্ফূর্তি হল না। দেখি ছোট ছোট ছিদ্রওলা ফুলের মত একটা তারা আর তার মাঝখানে গোল গর্ত। বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। 'খুনের দল' চীৎকার করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পেছনের ছোকরাটা রিভলবারের নলটা আমার পিঠে ঠেকিয়ে বলে উঠল : 'প্রাণের মায়া থাকে তো একচুল নড়ো না।'

চুপ করে বসে রইলাম। জিজ্ঞেস করলাম : 'কি চাও তোমরা ?' ছোকরা জবাব দিল : 'হাঁদাটা যদি তোমার গায়ে গিয়ে না পড়ত তো কথাটার জবাব দেওয়ার দরকার হত না। আমরা তোমার গাড়িটা চাই।' দাঁতে দাঁত চেপে ফরসা লোকটা বলল : 'আমি হাঁদা নই।' জবাব এল : 'হাঁদা ছাড়া কী ? আমাদের ঠিক ছিল না, আমি পেছন থেকে গুলি করব ? নড়লে কেন তুমি ? ফরসা লোকটা বলল : 'আমাদের কিন্তু এও ঠিক ছিল যে পিনাকে নিয়ে তুমি কোনো ঝামেলা করবে না। তুমি নড়াচড়া করেছ।' মেয়েটা হাসতে শুরু করল।

বলল: 'আমরা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছি।' 'কেন?' 'কারণ রোমে ফিরে গিয়ে ও আমাদের কথা পুলিশের কানে তুলবে।' 'ঠিক কথা।' ফরসা লোকটা বলল। পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল নীরবে। পেছনের ছোকরাটা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল: 'এখন কি করা যায় বল ত?' ছোট্ট আয়নাটা দিয়ে দেখলাম মেয়েটা এক কোণে পড়ে আছে। আমার দিকে বুড়ো আঙুল তুলে কি যেন দেখাচ্ছে। মনে হল ও যেন বলতে চাইছে: 'ওকে সাবাড় করে ফেলো।' আবার আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। কিন্তু ছোকরাটার কথা শুনে ভয় কেটে গেল। বেশ জোর দিয়ে সে বলল: 'না, তা হয় না। কিছু কিছু ব্যাপার একবারই করা যায়।'

আমার সাহস ফিরে এল। বললাম: 'ট্যাক্সিটাকে নিয়ে তোমরা কি করবে? নাম্বারটা পাল্টাবে কে? আর নতুন করে রংই বা করবে কে?' প্রত্যেকটা প্রশ্ন করছিলাম আর টের পাচ্ছিলাম এসব ব্যাপারে ওরা কিছুই কিছুই ভাবেনি। এবং যেহেতু আমাকে মেরে ফেলতে পারেনি, তাই এখন গায়েব করতে সাহস পাচ্ছে না। যাহোক, ছোকরাটা বলল: 'আমাদের সব কিছু আছে। সেসব তোমাকে ভাবতে হবে না।' কিন্তু ফরসা লোকটা ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল: 'কিছুই ঠিক নেই আমাদের। থাকার মধ্যে আছে তিন জনে মিলে হাজার কুড়ি লায়ার আর একটা রিভলবার। সে রিভলবার দিয়ে আবার গুলি করতে গিয়েও করা গেল না।' সেই মুহূর্তে ফের আমি চোখ ফেরালাম ছোট্ট আয়নাটার দিকে। দেখি মেয়েটা আমাকে দেখিয়ে সেই বিশেষ ভঙ্গিটা করছে। তখন মেয়েটাকে আমি বললাম: "সিনোরিনা, আমরা রোমে ফিরে যাবার পর ওই ভঙ্গিটার জন্যে কিন্তু তোমাকে বাড়তি আরো কয়েকটা বছর জেলখানায় কাটাতে হবে।' বলে খানিকটা ফিরে দেখলাম ছোকরাটা তখনো তার রিভলবারটা আমার পেছনে তাক করে রয়েছে। তা দেখে বিরক্তিতে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'তুমি অপেক্ষা করছো কার জন্যে? গুলি করো, কাপুরুষ কোথাকার।' থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে আমার স্বর প্রতিধ্বনিত হল। এবার আমার প্রতি মেয়েটার করুণা হল। আমাকে দেখিয়ে ও চেঁচিয়ে বলল: 'এখানে সাহস যদি কারুর থাকে তো ওরই আছে।' ছোকরাটা শাপমন্যি দেবার মত করে কি যেন বিড়বিড় করল। একদিকে থুথু ফেলল। তারপর দরজা খুলে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

জানলার কাছে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ রেগেই বলল: 'এখন চটপট বলে ফেল দিকিনি, আমাদের রোমে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আর পুলিশের কানে কিছু তুলবে না, এই দুটি কাজ করতে কত চাই তোমার?' বুঝলাম বিপদ কেটে গেছে। ধীরে সুস্থে জবাব দিলাম: 'আমার কিছুই চাই না। সোজা রেজিনা কোয়েলি জেলে নিয়ে যাবো তোমাদের—তোমাদের তিনজনকেই।' একথা শুনে ছোকরাটা কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। সে তিতিবিরক্ত আর মরীয়া হয়েই ছিল। সে শুধু বলল: 'তাহলে মেরেই ফেলতে হচ্ছে তোমাকে।' বললাম: 'বেশ তো, চেষ্টা করেই দেখো না। কারুকেই মারতে পারবে না তুমি। আর এও বলে রাখছি, তোমার ওই নোংরা মেয়েবন্ধুটাকে আর ওই ছোকরাকেও আমি হাজতবাস করিয়ে তবে ছাড়ব।' 'আচ্ছা, বেশ।' নীচু গলায় বলল ও। দেখলাম বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। সত্যি সত্যিই এক পা পেছিয়ে পিস্তলটা তুলে ধরল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা: 'থামো। টাকা দিতে না চেয়ে তোমার রিভলবারটা দেখিয়ে কাজ করিয়ে নাও। যা বলবে ও ঠিক তাই করবে।' কথাগুলো বলতে বলতে মেয়েটা ওর শরীরটা বাঁকিয়ে আমার পেছনটায় এসে দাঁড়াল। টের পেলাম আমার কানে খুব আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। লোক দুটো সেটা টের পেল না। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি। কারণ বলেছি তো, মেয়েটা আমার মনকে টেনেছিল। আর কেন জানি না, আমার মনে হল আমিও ওর মনকে টেনেছি। ছোকরাটার দিকে তাকালাম। তখনো ও আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়েছিল। আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকালাম, ওর কালো চোখ দুটি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। ছোকরাকে তখন বললাম: 'তোমার টাকা তোমার কাছেই রেখে দাও। আমি তোমার মত বোম্বেটে নই। কিন্তু তোমাদের রোমে নিয়ে যাচ্ছি না আমি। বড় জোর ওকে নিয়ে যেতে পারি। আর তাও নেহাৎ ও মেয়েছেলে বলে।' ভেবেছিলাম নির্ঘাত ওরা আমার কথার প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সেদিক দিয়েই গেল না ওরা। ফরসা লোকটা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বলল: 'আশা করি নিরাপদেই তোমরা পৌছবে।' ছোকরা রিভলবার নামিয়ে ফেলল। মেয়েটা তক্ষুণি এসে আমার পাশে বসল। বললাম: 'চলি তবে। আশা করি জেলে যেতে তোমাদের দেরী হবে না।' এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছি আর অন্য হাতটায় মেয়েটা চাপ

দিচ্ছে। কেন যে আমি অত নরম হয়ে গেলাম লোকদুটো সেটা বুঝল কি বুঝল না তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

রাস্তায় উঠলাম আবার। পাঁচ কিলোমিটার পথ মুখ না খুলে গাড়ি চালিয়ে গেলাম। মেয়েটা সারাক্ষণ আমার পাণিপীড়ন করেই চলেছে। বেশ খোস-মেজাজে যাচ্ছি। আমিও এখন খুঁজছিলাম একটা নিরিবিলি জায়গা। উদ্দেশ্য যদিও ভিন্ন। কিন্তু গাড়িটা থামিয়ে সমুদ্রের পথ ধরবার চেষ্টা করতেই স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখল মেয়েটা। বলল: 'না সেটি চলবে না। আমরা সোজা রোমে ফিরে যাচ্ছি।' আমি স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম: 'আজ বিকেলেই আমরা রোমে ফিরে যাবো।' তার জবাবে মেয়েটা বলল: 'বুঝতে পারছি, তুমিও আর সবারই মত।' ঠাণ্ডা মেরে গেল মেয়েটা। আমার কানের কাছে প্যান প্যান করতে লাগল। যখনি ওকে জড়িয়ে ধরতে যাই, ও একবার এদিক একবার ওদিক এলিয়ে পড়ে। চুমু খাওয়া আর হয় না। আমার রক্ত তখন ফুটছে। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। হঠাৎ বুঝলাম, মেয়েটা আমাকে আগা-গোড়া খেলিয়েছে। আর এই যাত্রার ফল, খামোকা পেট্রোল নষ্ট, সময় নষ্ট। চটেমটে ধাক্কা মেরে ওকে কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম: 'জাহান্নামে যাও তবে। ওখানেই থাকো।' সঙ্গে সঙ্গে এককোণে ও চুপ মেরে পড়ে রইল। একটুও রাগটাগ করল না। আবার চলতে আরম্ভ করলাম আমরা। এবং রোমে না পৌঁছনো পর্যন্ত দুজনের কেউই মুখ খুললাম না।

রোমে পৌঁছে গাড়ি থামিয়েই সজোরে দরজা খুলে বললাম: 'নাও, বেরিয়ে এসো। এবার দূর হও।' অবাক হবার ভান করে ও বলল: 'কিন্তু সত্যিই কি তুমি আমার ওপর রাগ করলে?' আর আমি সইতে পারলাম না। চেঁচিয়ে বললাম: 'কচি খুকি কোথাকার। আমাকে তুমি খুন করতে চেয়েছিলে। তারপর আমার পেট্রল পুড়িয়েছ, সময় নষ্ট করিয়েছ, টাকা খরচ করিয়েছ। আর এখন বলছ আমি রাগ করেছি কিনা। ঈশ্বরকে ডাকো যে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছি না তোমাকে।' মেয়েটা আমার এ কথার কি জবাব দিয়েছিল জানেন? 'তোমাদের ছেলেদের সবেতেই বাড়াবাড়ি।' বলে রীতিমতো মর্যাদার সঙ্গে, গর্বিত ও স্পর্ধিতভাবে গাড়ি থেকে নেমে এলো। ওর ওই আঁটো-সাঁটো সাপের মত পোশাকপরা শরীরটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পোটাসানগিয়োভান্নি-র লোকজনের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

□ কোলের শিশু □

সেদিন শিশু কল্যাণ সমিতির ভালোমানুষ মহিলাটি যখন আমাদের বাড়ীতে এসে আর সবার মত জিজ্ঞেস করলেন কেন অতগুলো বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিয়েছি, আমার স্ত্রীর মেজাজটা সেদিন বিগড়ে ছিল বলেই বোধহয় সোজাসুজি সত্যি কথাটাই সে বলে বসল: 'যদি পয়সার জোর থাকত তো সিনেমা দেখতে যেতুম বিকেলে···তা তো নেই, তাই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি, আর বাচ্চা কাচ্চাও হয়।' কথাটা শুনে মহিলাটির মুখ অস্বস্তিতে ভরে গেল। এবং একটিও আর কথা না বাড়িয়ে তিনি বিদায় নিলেন। স্ত্রীকে বকুনি দিয়ে বললাম, 'সব সময় সত্যি কথা বলাটা কোনো কাজের কথা নয়, আর তাছাড়া দেখতে হবে তো কার সঙ্গে কথা কইছো।'

যখন বিয়ে করিনি আর বয়েসও ছিল কাঁচা, তখন খবরের কাগজে স্থানীয় নানা ঘটনার খবর খুঁজে খুঁজে পড়তুম।—ডাকাতি, খুন, আত্মহত্যা, পথ দুর্ঘটনা জাতীয় নানাধরণের বিপত্তির খবরা-খবর। এসব ঘটনার মধ্যে যেটা আমার জীবনে ঘটতে পারে বলে কখনোই মনে হয় নি তা হল, সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা'—অর্থাৎ কোনও বিশেষ দুর্ভাগ্য ছাড়া শুধু বেঁচে থাকার কারণেই যে লোক অনুকম্পার পাত্র। আগেই বলেছি, তখন আমার কাঁচা বয়েস। তাই বহু পুষ্যির পরিবার সামলানো যে কি ব্যাপার তখনো সেটা টের পাইনি। তাই সবিস্ময়ে একদিন দেখলাম আমি নিজেই সেই দুর্ভাগ্য জনক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছি। ওই অল্প বয়সে মাঝে মাঝেই এরকম খবর তখন নজরে আসতো: 'এরা চরম দারিদ্রে দিন কাটায়।' এখন আমি নিজেই চরম দারিদ্রে দিন কাটাই। কিংবা তখন পড়োছি 'এরা এমন বাড়িতে থাকে যা নামেই শুধু বাড়ি।' আমি এখন টরমারানসিওতে স্ত্রী আর দুটি সন্তান নিয়ে এমন একটা ঘরে থাকি, যে-ঘরে মেঝের ওপর একগাদা মাদুর শুধু বিছানো রয়েছে। আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। অথবা এমন খবরও তখন দেখেছি: 'পোয়াতি হয়েছে টের পেয়ে ওই হতভাগিনী নিজের সন্তানকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে বলে স্থির করেছে।' আমরাও

স্থির করেছি ঠিক তাই। আমি আর আমার স্ত্রী দুজনেই সাত বারের বার ঠিক ওই একই সিদ্ধান্ত নিলাম। ঠিক হল, ঠাণ্ডা একটু কমলে আমাদের কোলের শিশুটিকে কোনো গির্জায় রেখে দিয়ে চলে আসব। প্রথম যার নজরে পড়বে তারই দয়ার উপর নির্ভর করবে ওই শিশুর ভাগ্য।

সেই শিশু কল্যাণ সমিতির মহিলাদের কল্যাণেই আমার আসন্নপ্রসবা স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হল এবং প্রসবের পর সুস্থ বোধ করতেই বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে বউ বলল: 'জানো, যদিও হাসপাতাল হাস-পাতালই, তবু এখানে আসার চেয়ে ওখানে থাকতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।' কথাটা যেন ধরতে পেরেই বাচ্চাটা এমন কান্না জুড়ে দিল যে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বেশ সুস্থ সবল সুন্দর একটা ছেলে। আর গলায় জোরও বেজায়। কাজেই রাত্তিরে জেগে উঠে শ্রীমান যখন কান্না জুড়ে দিত, কার সাধ্য ঘুমোয়।

মে মাস এল। এখন গায়ে ওভারকোট না চড়িয়েই বাইরে বেরুনো যায়। একদিন আমরা রোমের পথে পা বাড়ালাম। অনেক কাঁথাটাথা জড়িয়ে বাচ্চাটাকে বুকের কাছে নিয়ে আমার স্ত্রী চলেছে। শহরে পা দিতেই সে অনর্গল বকে চলল, বোধহয় শহরে আসার আসল উদ্দেশ্যটা চাপা দেবার জন্যেই। খুব ক্লান্ত লাগছিল ওকে। আর যেন দম নিতে পারছে না। চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, চোখ ঠিকরে আসছে। কোন্ কোন্ গির্জায় বাচ্চাকে রেখে আসা যেতে পারে সেকথা বলছিল আর এমন গির্জার নামই করছিল যেখানে ধনী ব্যক্তিদের যাতায়াত। তা নয়ত আমাদের মত হা-ঘরের হাতে পড়া আর বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখা সমান কথা। পর মুহূর্তেই সে বলল, এমন গির্জায় রেখে আসতে হবে যে-গির্জা মেরী মাতার নামে উৎসর্গিত। কেন না মেরী মাতাই ঠিক বুঝবেন ওর মনের কথা। এসব কথাবার্তা আমার মোটেই ভাল ঠেকছিল না। মনে মনে উত্তেজিত হয়েও পড়ছিলাম। নিজের মনে অপমানিত বোধ করছিলাম বলে আরো খারাপ লাগছিল—কারণ কাজটায় তো আমার মনের কোনো সায় ছিল না। নিজের মনকে বোঝালাম এখন আমার মাথা গরম করলে চলবে না। মুখের শান্ত ভাব বজায় রাখতে হবে, স্ত্রীর মনে সাহস যোগাতে হবে। বলতে গেলে ওর কথার তোড় থামাতেই আমি কিছু কিছু আপত্তি তুলে তারপর এক সময় বললাম, 'আচ্ছা, আমরা তো ওকে সেন্ট পিটার্স গির্জায়

রেখে চলে আসতে পারি।' খানিকক্ষণ ইতস্তত করে স্ত্রী বলল: 'না না, সে বিরাট জায়গা…কারুর চোখেই ও পড়বে না হয়ত…তার চেয়ে ভাবছি ভিয়া কন্দত্তির উপরে যে-ছোট্ট গির্জাটা আছে ওখানেই রেখে আসব ওকে ·সুন্দর-সুন্দর দোকানপাট, পয়সাওয়ালা লোকেদের যাতায়াত—ওখানেই রেখে আসব।'

বাস ধরলাম। অন্যান্য যাত্রীদের মাঝখানে স্ত্রী চুপচাপ বসে রইল। থেকে থেকে কেবল কম্বলটা আরো ভাল করে বাচ্চার গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছিল, কিংবা সন্তর্পনে ঢাকা সরিয়ে খোকনের মুখ দেখে নিচ্ছিল। লাল-লাল ফরসাপানা মুখখানা। বাচ্চা ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। বাচ্চার গায়ের জামাকাপড়ের অবস্থা আমাদেরই মতো শোচনীয়। সুন্দর বলতে শুধু একটা জিনিসই ছিল—হাতের নীলরঙা ছোট্ট দস্তানা দুটি। হাত দুটো খোকা বাড়িয়ে রেখেছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে তার হাতদুটি দেখাচ্ছে। লারগো গোল্ডনিতে এসে আমরা নেমে পড়লাম। আমার স্ত্রীর বকর বকরও আবার শুরু হল। একটা গয়নার দোকানের কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাল ভেলভেটে মোড়া গয়নাগুলো দেখিয়ে বলল: 'দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর…এ রাস্তায় যারা আসে তারা গয়না-গাটি আর সুন্দর সুন্দর জিনিসই কেনাকাটা করতে আসে ··গরীব-টরীব লোক এখানে আসে না ··বড়লোকেরা এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যাবার ফাঁকে গির্জায় ঘুরে যায় ··সেই সময়টায় ওদের মন মেজাজও ভাল থাকে, ওরা আমার বাচ্চাকে দেখে ঠিক কুড়িয়ে নেবে··গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে আপন মনে কথাগুলো বলে গেল। সাহস হল না কিছু বলি। গির্জার ভেতরে ঢুকলাম। ছোটখাট গির্জা এমন ভাবে রঙ করা যে দেখে মনে হবে হলদে পাথরের তৈরী বুঝি। ছোট ছোট অনেকগুলি চ্যাপেল, উঁচু বেদী। স্ত্রী বলল, তার যেন মনে হচ্ছিল গির্জাটা অন্যরকম ·দেখতে। এখন আবার দেখে তার মোটেই সুবিধের লাগছে না। যাহোক, পূতবারিতে আঙ্গুল ডুবিয়ে যীশুকে স্মরণ করল। এরপর কোলে শিশু নিয়ে সারাটা গির্জা ধীরে ধীরে ঘুরে দেখল। চোখ মুখে অসন্তোষ আর অবিশ্বাসের ভাব স্পষ্ট। উপরের কাঁচ দিয়ে আসছে স্বচ্ছ নরম আলো। আমার স্ত্রী সব জায়গা ভাল করে দেখছিল কোথায় এই শিশুকে রেখে আসা যায়। আমি কিছুটা দূরে পেছনে পেছনে আসছিলাম। নজরটা অবশ্য দরজার দিকে সবসময়ই ছিল।

হঠাৎ ভেতরে এসে ঢুকল এক দীর্ঘাঙ্গী তরুণী। লাল পোশাক পরা, মাথায় সোনালী চুল। তরুণীটি হাঁটু ভেঙে বসল, পরনের আঁটসাঁট পোশাক টান-টান হয়ে হয়ে রইল। মিনিট খানেক প্রার্থনার পরই সে বেরিয়ে গেল। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। এতক্ষণ ধরে আমার স্ত্রী তরুণীটিকে লক্ষ্য করছিল, এবার হঠাৎ বলে উঠল: 'নাঃ, এখানে হবে না,·· এখানে যারা আসে তারা সবাই ওই মেয়েটারই মত···বড্ডো তাড়া ওদের, কোনোদিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই·· চলো চলে যাই।' এই বলে সে গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

করসো ধরে কিছুটা পথ পেছিয়ে গেলাম। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গেলাম। স্ত্রী আগে আগে, আমি পেছনে পেছনে। এবার বিয়াজ্জা ভেনোজিয়ার কাছাকাছি আরেকটা গির্জায় ঢুকে পড়লাম। এটা আগের গির্জার চেয়ে ঢের বড়। ভেতরটা অন্ধকারই বলা চলে। রকমারি অলংকারের কাজ চারিদিকে—মৃদু আলোয় ঝিকমিক করছে। বহু লোক এখানটায়। একনজর তাকিয়েই বুঝলাম, এরা বেশ স্বচ্ছল। মহিলাদের সকলের মাথাতেই টুপি, পুরুষেরা সুবেশ। বেদীর উপরে একজন পুরোহিত হাত নেড়ে নেড়ে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতে ভালোই হল। কারুর নজরই আমাদের দিকে নয়। চুপি চুপি স্ত্রীকে বললাম: 'এবার একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি, ওকে এখানে রেখে যাওয়া যায় কিনা?' মাথা নেড়ে স্ত্রী সম্মতি জানাল। একপাশে চলে এলাম। বেশ অন্ধকার এখানটায়। কেউ কোথাও নেই। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। কম্বলের একটা কোণ দিয়ে বাচ্চাটার মুখটা ঢেকে নিয়ে স্ত্রী একটা চেয়ারের উপর ওকে রাখল। বোঝা ঝেড়ে ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মত করেই। এরপর মুখটা হাতে ঢেকে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করল। আর আমি কি করব বুঝতে না পেরে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম। শেষে সে উঠে দাঁড়াল, মুখের ভাব স্থির, ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। কিছুটা দূরে আমি দাঁড়িয়ে। ধর্মযাজকটি ঠিক সেই মুহূর্তে বেশ জোর করে বলে উঠলেন: 'তখন যীশু বললেন, পিটার কোথায় চলেছ তুমি?' আমি চমকে উঠলাম। মনে হল, কথাটা যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। এদিকে আমার স্ত্রী দরজার পর্দা যেই তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে একটা গলার আওয়াজে দুজনেই দারুণ চমকে গেলাম: 'সেনোরা, আপনি ওই দিকের চেয়ারটায় আপনার জিনিস ফেলে

যাচ্ছেন।' তাকিয়ে দেখি কালো পোশাক পরা এক রমণী—ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে এমনই একজন। স্ত্রী বলল, 'তাই তো বটে, ধন্যবাদ···একদম ভুলে গিয়েছিলাম।' কি আর করা। পুঁটলি তুলে নিয়ে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে স্ত্রী বলল: 'আমার এই বেচারা ছেলেটাকে কেউ চায় না। কথাটা এমনভাবে বলল, যেন বাজারে তার মাল কাটছে না। কেটে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু তারপর দেখে যে বাজারে কোন খরিদ্দারই নেই। এর মধ্যেই আমার স্ত্রী আবার উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছে। পিয়াজ্জা স্যান্তি অ্যাপসটলিতে আমরা চলে এলাম। গির্জা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকতে ভেতরের ছায়াচ্ছন্ন বিরাট চেহারাটা দেখে আমার স্ত্রী ফিসফিসিয়ে বলল: 'বুঝলে, এরকম জায়গাই দরকার আমাদের।' বলে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের উপর বাচ্চাকে রাখল। তারপর প্রার্থনা-টার্থনা বা বাচ্চার কপালে চুমো খাওয়া এসব কিছুই না করে এমনভাবে ছুটে চলে এল দরজার কাছে, যেন পায়ের নীচে মেঝে এত গরম যে সেখানে পা রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই গোটা গির্জাটা কাঁপিয়ে শিশুর কান্নার স্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। খাবার সময় হয়েছে বাচ্চার, খিদের জ্বালায় কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে সেটা সে জানান দিয়েছে, তাই তার কান্না। এমন তারস্বরে কান্নার আওয়াজে আমার স্ত্রী সম্ভবত মাথা ঠিক রাখতে পারল না। প্রথমে সে দরজার কাছে ছুটে গেল, তারপর ফের ছুটে ফিরে এলো। একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে স্থানকাল বেমালুম ভুলে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে মাই দেবার জন্য ব্লাউজ খুলল। মাই দেখামাত্র বাচ্চা হামলে পড়ে দুহাতে মাই চেপে ধরল। তার কান্নাও থেমে গেল। কিন্তু রূঢ়স্বরে কে যেন বলে উঠল: 'এখানে এসব চলবে-টলবে না, এটা পুণ্যস্থান, বুঝলে·· বেরোও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।' তাকিয়ে দেখি গির্জারই একজন। ছোটখাট এক বৃদ্ধ, চিবুকে একগোছা দাড়ি। লোকটা ছোটখাট হলে কি হয়, বাজখাঁই গলার আওয়াজে বুকের উপর ব্লাউজটা টেনে এবং বাচ্চার মাথার উপর কম্বলটা যথাসম্ভব জড়িয়ে আমার স্ত্রী উঠতে উঠতে বলল: 'ছবিতে কিন্তু মেরী মাতা সবসময়ই শিশুকে কোলে নিয়ে আছেন দেখা যায়।' সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তিড়বিড়িয়ে উঠল: 'কী এত বড় আস্পর্ধা। নিজেকে তুমি মেরী মাতার সঙ্গে তুলনা করছ?' যাহোক, গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম। পিয়াজ্জা ভেনেজিয়ার বাগানে গিয়ে বসলাম। স্ত্রী

বাচ্চাকে ফের মাই দিল। আকণ্ঠ পান করে তৃপ্ত হয়ে শ্রীমান আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সব গির্জা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খুব ক্লান্ত বোধ করছি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। যে কাজ করা উচিত নয় অথচ সেকাজ করতেই এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, এই ভাবনাটাই আমায় অস্থির করে তুলল। স্ত্রীকে বললাম: 'শোনো, বেলা পড়ে আসছে। আর আমি এভাবে পারছি না। যা করতে হয়, ঠিক করে ফেলা দরকার।' কিছুটা তিক্তস্বরে সে জবাব দিল: 'কিন্তু ওতো তোমারই সন্তান, তোমারই রক্ত ওর শরীরে বইছে। যেখানে খুশি একটা পুঁটলির মতো ওকে তো আর ফেলে দিয়ে যেতে পারি না।' 'না-না, তা কেন?' তাড়াতাড়ি বলি, 'আসলে কি জানো? এমন কতগুলো জিনিস আছে যা না ভেবে তক্ষুনি করে ফেলতে হয়, নয়ত কোনকালেই আর করা হয় না।' উত্তর এল: 'আসলে তা নয়। তুমি ভয় পাচ্ছ, পাছে আমি মত বদলে ফেলি, ওকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাই· তোমরা ছেলেরা প্রত্যেকে একেকটা কাপুরুষ।' এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করাটা যে উচিত হবে না সেটা বুঝলাম। তাই সংযতভাবে বললাম: 'ছ্যাখো, ভেবো না তোমার মনের কথাটা আমি বুঝি না।···তবে কি জানো, আমাদের ওই আস্তানায় মানুষ হওয়ার চেয়ে অন্য যে কোন জায়গায় থাকা ওর ভাল, এটা তো মানো?' একথায় কিন্তু কোন জবাব এলো না।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন তেরি দিনেরোন-এর পথে ভিয়া ন্যাজিওজেল ধরে চলতে শুরু করে দিয়েছি। হঠাৎ নজরে পড়ল ছোট্ট সরু একটা রাস্তা, একেবারে জনমানবশূন্য। একটা বাড়ির দোরগোড়ায় ধূসর-রঙা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কি মনে করে হঠাৎ এগিয়ে গেলাম। হাতলে চাপ দিতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। স্ত্রীকে বললাম: শিগগির করো, এই-ই সুযোগ·· ওকে পেছনের সীটে রেখে দাও। স্ত্রীও কথামত পেছনের সীটে বাচ্চাকে রেখে গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল। মুহূর্তে কাজটা সমাধা হয়ে গেল। কেউ কিছু দেখল না। স্ত্রীর হাত ধরে তাড়াতাড়ি পিয়াজ্জা দ্যেল কুইরিনেল অভিমুখে রওনা দিলাম।

আশপাশে কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার হয়ে এসেছে। শুধু বড় বড় বাড়িগুলির তলায় আলো জ্বলছে। প্রাচীরের ওপারে অদূরেই রোম নগরী

আলোয় ঝলমল করছে। মিনারের তলাকার ফোয়ারাটার কাছে গিয়ে আমার স্ত্রী একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল। হঠাৎ মুখ নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'কি হল আবার?' স্ত্রী বলল: 'রেখে এসে এখন বড্ড ওর কথা মনে পড়ছে···হাত দিয়ে চেপে স্তনের যেখানটায় ধরে থাকত, সেখানটায় বড্ড খালি খালি লাগছে।' সাহস করে বলে উঠলাম: 'সে তো হবেই···তবে এ কেটে যাবে।' একটু থেমে থেকে ও আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সহসা ওর চোখের জল শুকিয়ে গেল···বাতাস বইলে রাস্তায় বৃষ্টি ধারা যেমন করে শুকিয়ে যায় তেমনি। হঠাৎ ও রেগে উঠে ওই বড় বাড়িগুলির একটাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল: 'আমি যাচ্ছি ওখানে, রাজার সঙ্গে আমি দেখা করে সব খুলে বলব ওঁকে।' খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেললাম। চেঁচিয়ে বললাম: 'থামো। খেপে গেলে নাকি? তাছাড়া রাজা এখন এখানে নেই।' ও বলল: 'না থাকুন। অন্য কেউ ত আছেন ওঁর জায়গায়, তাঁকেই বলব।' বলতে বলতে প্রাসাদের বড় দরজার দিকে সে ছুট দিল। কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসত কে জানে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম: 'শোনো, কথাটা আমি নিজেও মনে মনে ভাবছিলাম·· চলো, ফিরে গিয়ে গাড়ি থেকে বাচ্চাকে না হয় নিয়েই আসি ··ওকে বরং আমাদের কাছে রেখে দিই। সংখ্যায় আরেকটি বাড়বে বই ত নয়··' এতক্ষণে আসল কথাটা বলে ফেলেছি। বলা বাহুল্য, কথাটা ওর মনে ধরল। রাজার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা স্রেফ চাপা পড়ে গেল। 'কিন্তু গিয়ে কি ওকে দেখতে পাব?' বলতে বলতে সে পা চালিয়ে চলল গাড়ির দিকে। বললাম: 'আছে আছে। পাঁচ মিনিটও ত হয়নি'

গাড়িটা সত্যি সত্যি তখনো ওখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমার স্ত্রী যেই গাড়ির দরজাটায় হাত দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ছোটখাট মাঝবয়েসী একটা লোক ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। লোকটার চেহারা বেশ কর্তৃত্বব্যঞ্জক। চেঁচিয়ে সে বললে: 'আরে এ কী···কি চাই আমার গাড়িতে?' পেছনে না না ফিরে সীট থেকে বাচ্চাকে তুলে নিতে নিতে আমার স্ত্রী জবাব দিল: 'আমার জিনিস আমি নিয়ে যাচ্ছি।' লোকটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে বলল: 'ওখানে আবার তোমার কি জিনিস আছে? গাড়িটা আমার, বুঝলে? ওটা আমার জিনিস।' আমার স্ত্রীর মুখ তখন দেখবার মত। কোমর বেঁধে সে লোকটার

কাছে গিয়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে বলল: 'বলি তোমার জিনিস কে নিচ্ছে হে? ভয় নেই কেউ কিচ্ছু নিচ্ছে না তোমার। আর ওই গাড়ি? অমন গাড়ির মুখে আমি থুথু ফেলি···এই ছাখো।' বলে সত্যি সত্যিই সে গাড়ির দোরে থুথু ফেলল। 'কিন্তু ওই পার্শেলটা···?' লোকটা হতভম্বের মত বলতে যাচ্ছিল। 'আজ্ঞে এটা পার্শেল নয়, আমার বাচ্চা···এই ছাখো ইচ্ছে হয় ত।' স্ত্রী মুখ নাড়া দিয়ে উঠল।

বাচ্চার মুখের ঢাকা সরিয়ে লোকটাকে সে দেখাল। তারপর বলে চলল: 'এরকম টুকটুকে বাচ্চার জন্ম দেওয়া তোমার আর তোমার বউয়ের কম্মো নয়— আবার নতুন করে জন্মালেও নয়·· খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো না। চেচিয়ে পুলিশ ডাকবো···বলব আমার বাচ্ছা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলে তুমি।' লোকটাকে সে অ্যায়সা ধাতানি আর ভয় পাইয়ে দিলে যে বেচারা মুখ লাল করে স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইল। আমার স্ত্রী ধীরে সুস্থে হেঁটে রাস্তার মোড়ে চলে এল। আমি ওখানটাতেই দাঁড়িয়েছিলাম।

□ ভগ্নিপতি □

আমার ভগ্নিপতি রেমন্‌ডোর সমস্ত ব্যাপারেই যবনিকাপাত ঘটে ওই ভাবে। দিদির জন্য দুঃখ হয়, কিন্তু দোষটা আমার নয়। সবে শীতটা কেটেছে, গরম আমেজ বাতাসে। ভোরবেলায় উঠে পড়েছি। স্নানের পোশাক আর তোয়ালেটা জড়িয়ে একটা পুঁটলি করে সাইকেলের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছি। এরপর সাইকেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি। উদ্দেশ্য চোখ এড়িয়ে চুপিচুপি অস্তিয়া অভিমুখে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু মন্দ বরাত আর কাকে বলে। বাড়িতে অত লোক ঘুমোচ্ছে, অথচ সিঁড়ির চাতালে ওই অত ভোরে দাঁড়িয়ে কিনা রেমন্‌ডো স্বয়ং। আমার পুঁটলির দিকে তার নজর গেল সঙ্গে সঙ্গে। বলল: 'যাচ্ছ কোথায়?' বললাম: 'অস্তিয়ায়।' 'কাজের কি হবে?' 'কোন্ কাজ?' 'ন্যাকামো কোঁর না·· ···অস্তিয়ায় সোমবারও যেতে পারবে·· এখন আমাদের দোকানে যেতে হবে।' রেমন্‌ডো লম্বা-চওড়া যুবক, আর আমি ছোটখাট রোগা চেহারার। সাইকেলটা জোর করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দেয়াল-আলমারিতে তুলে রাখল। তারপর আমার হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল: 'চলো, দেরী হয়ে গেছে।' বললাম: 'মোটেই দেরী হয়নি। যা কাজ করি না ছাই।' রেমনডো কিছু বলল না। কিন্তু বিলক্ষণ টের পেলাম, ওর দুর্বল স্থানে গিয়ে লেগেছে। দিদির টাকায় সেলুন খুলেছে সে। কিন্তু সেলুন মোটেই সুবিধের চলছে না।

নীরবে দুজনে হেঁটে চলেছি। চড়া রোদ। সেলুন বাড়ির কাছেই, পুরনো রোম নগরীর কেন্দ্রস্থল ভিয়া দেল সেমিনারিওয়। গোড়াতেই এটা ভুল হয়েছে। কেননা এই রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত নেই. তাছাড়া এখানে শুধু অফিস আর গরীব লোকের বাস। দোকানে এসে পৌছতে রেমন্‌ডো খড়খড়ি তুলে দিল। গায়ের জ্যাকেট খুলে অ্যাপ্রন পরে নিল। আমিও তাই করলাম। পাওলিনোও এসে পৌছল। সে আসামাত্র রেমন্‌ডো তার হাতে ঝাড়ু তুলে দিয়ে ভালভাবে জায়গাটা ঝাঁট দিতে বলল। কারণ তার মতে,

সেলুনের গোড়ার কথাই হল তাকে ঝকঝকে তকতকে রাখা। কিন্তু হাজার ঝাঁটপাট দিলেও কি হবে, টিন কি কখনো সোনা হয়? প্রথমত জায়গা বাছাই ঠিক হয়নি, তাছাড়া দোকানটার একেবারে হতশ্রী চেহারা। দেয়ালে এমন রং যে মনে হয় বুঝি মার্বেলে তৈরী, সস্তা সব কাঠের চেয়ার, শেলফগুলো ফ্যাকাশে নীল রঙা, অন্য জায়গা থেকে আনা কিছু দাগধরা ভাঙা চিনেমাটির বাসন আর দিদির সেলাই-করা কিছু কাপড় ও তোয়ালে—এসব নিয়ে এই সেলুন। পাওলিনো মেঝে ঝাঁট দিয়ে দিল। রেমনডো একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে তার প্রথম সিগারেট খেল। ঝাঁটপাট সারা হলে রেমনডো বেশ রাজকীয় চালে পাওলিনোর হাতে কুড়ি লায়ার দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনে আনতে বলল। খবরের কাগজ নিয়ে ছোকরা ফিরে এলে খেলাধুলোর পাতায় সে ডুবে গেল। দোর-গোড়ায় পাওলিনো বসে। কাজ নেই, বেড়ালের ল্যাজ ধরে টানছে। আর আমি বসে আছি দোকানের বাইরে। রাস্তার দিকে হাপিত্যেশ করে তাকিয়ে আছি তো আছিই। আগেই বলেছি, এ-রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত বিশেষ নেই। এক ঘণ্টা বসে সবসুদ্ধ জনা দশেক লোককে যেতে দেখলাম। সবাই প্রায় স্ত্রীলোক—বাজার সেরে থলে হাতে ফিরছে। বাড়ীগুলোর আড়াল থেকে এক সময় সূর্যের আলো রাস্তায় এসে পড়ল। তখন আমি ভেতরে গিয়ে আরেকটা চেয়ারে বসে রইলাম।

আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু কোন খরিদ্দারের পাত্তা নেই। হঠাৎ রেমনডো হাতের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিল। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল: 'খদ্দের যখন নেই তখন এসো, সেরাফিনো·· তুমি বরং আমার দাড়িটাই কামিয়ে দাও।' ওর দাড়ি রেমনডো এর আগেও আমাকে দিয়ে কামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু সেদিন আমায় যে সে অস্তিয়ায় যেতে দেয়নি সে-কথাটা তখনো ঘুরছিল মাথায়। কোন কথা না বলে তোয়ালেটা টেনে নিলাম। খুব রূঢ় ভঙ্গীতে সেটা ওর চিবুকের তলায় গুঁজে দিলাম। অন্য কেউ হলে এতেই বুঝে নিত। কিন্তু রেমনডো সে-পাত্রই নয়। বেশ অহংকারের ভাব নিয়ে ঝুঁকে পড়ে আয়নায় নিজেকে দেখে নিচ্ছিল, গালের দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে দেখছিল।

পাওলিনো খুব উৎসাহের সঙ্গে সাবান তুলে দিল আমার হাতে। সাবানের ফেনা তুলে, যেন ডিম ফেটছি এমনি করে, রেমনডোর গালে ব্রাশের ঝাপটা

লাগাতে লাগাতে চোখ ছুঁই-ছুঁই প্রায় সারাটা মুখ সাবানময় করে দিলাম এবং প্রায় হিংস্রভাবে ব্রাশ চালিয়ে দেখতে দেখতে ওর দুই গালে দুটো ইয়া বড় বড় সাবানের ফেনার গোলা বানিয়ে ফেললাম। তারপর ক্ষুর বাগিয়ে ধরে নীচের থেকে ওপরে খুব জোরে জোরে ক্ষুরের হ্যাঁচকা টান দিতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন ওর গলা কাটতে চাইছি। এতে ও বেশ ঘাবড়ে গেল। বলল: 'আরে আস্তে আস্তে হয়েছেটা কী তোমার?' কোন জবাব দিলাম না। তার বদলে ওর মাথাটা পেছনে ঠেলে দিয়ে এক হেঁচকা টানে গলা থেকে চিবুকের টোল পর্যন্ত সবটা সাবান সাফ করে দিলাম। একদম চুপ মেরে ছিল রেমনডো। কিন্তু আমি টের পাচ্ছিলাম ভেতরে ভেতরে সে রাগে ফুলছে। এভাবেই দাড়ি কামানোর পর্ব সমাধা করলাম। রেমনডো বেসিনে মুখ ধুয়ে ফেলল। ওর মাথা বানিয়ে দিতে গিয়ে বেশ কয়েকটা চড়-চাপড় চালালাম। তেমন সুবিধে থাকলে রীতিমত ঘুঁষিটুঁষিই বসিয়ে দিতাম। এরপর তার অনুরোধে ভালভাবে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে দিলাম। ভাবলাম এবার বুঝি ছাড়া পাব। ও বাবা, চেয়ারে ফের গা এলিয়ে দিয়ে বাবু বললেন: 'এবার চুলটা কেটে দাও।'

এবার প্রতিবাদ না করে পারলাম না। বললাম: 'এই ত সেদিন তোমার চুল কেটে দিয়েছি।' বাবু জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ তা দিয়েছ ঠিকই তবে কি না এখন ধারগুলো ছেঁটে দিতে হবে, চুল আবার গজাচ্ছে।' মনের বিরক্তিটা আবারো হজম করে যেতে হল। তোয়ালেটা ঝেড়ে আবার ওর গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। এটা অবশ্য না মেনে উপায় নেই যে রেমনডোর চুলের বাহার আছে—এক মাথা ঘন কালো চকচকে চুল লম্বা লম্বা হয়ে ঘাড় অবধি নেমে এসেছে। কিন্তু সেদিন ওই চমৎকার চুলই দারুণ বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল মনে। মনে হল, ওর ওই ইতর স্বভাবের সমস্ত অলসতা ও অহংকার যেন ওই চুলে দানা বেঁধে আছে। 'দেখো, একটু ছেঁটে দেবে খালি, ছোট করবে না।' বললেন মূর্তিমান। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম: 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' ওর চুলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডগাগুলো ছাঁটছি আর ভাবছি অস্তিয়ার কথা। একবার ইচ্ছে হল, দিই কাঁচি চালিয়ে ওই চকচকে চুলের গোছায়। দিদির কথা ভেবে কেবল চেপে গেলাম। রেমনডো কাগজটা আবার তুলে নিল। এবং আমার কাঁচির আওয়াজ এমনভাবে উপভোগ করতে লাগল যেন ক্যানারি পাখির মিষ্টি কিচির মিচির ডাক শুনছে। আয়নায় এক নজর তাকিয়ে আবার বললে: 'জানো,

ভালো নাপিতের গুণ তোমার আছে।' ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলি: 'আর তোমার কি আছে জানো? স্ত্রীলোকের অবৈধ উপার্জনের টাকায় দিব্যি চালিয়ে যাওয়ার গুণ।' চুলের ডগা ছেঁটে এবার আয়নাটা পেছনে রেখে দেখালাম। একটু বাঁকা গলায় বললাম: 'এবার কি হবে, শ্যাম্পু···নাকি ফ্রিক্শন?' ঠাট্টা করে কথাটা বলা, সে কিন্তু নির্বিকার মুখে জবাব দিলে: 'ফ্রিক্শন।' এবার আর পারলাম না। বললাম: 'রেমন্ডো, ছটা মাত্র বোতল আছে, আর তুমি একটাই নিজের জন্যে খরচ করে ফেলতে চাইছো!' কার কথা কে শোনে! বললে: 'যা বলছি তাই করো।· তোমার টাকা তো আর খরচা হচ্ছে না?' ইচ্ছে হল বলি: 'তোমার চাইতে অন্তত এ-টাকায় আমার দাবি বেশি।' বললাম না কিছুই। এবারেও দিদির কথা ভেবেই। দিদি এই লোকটার প্রেমেই একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। রেমন্ডোর ইচ্ছেই মেনে নিলাম। কোন্ গন্ধটা ওর চাই নির্লজ্জের মত সেটাও সে বার বার জানাতে ভুলল না। ভায়োলেট ওর পছন্দ। চুলের গোড়ায় ভাল করে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিতে বললে। এছাড়া আঙুলের ডগা দিয়ে নীচে থেকে ওপরদিকে ম্যাসাজ করে দিতেও বললে। ম্যাসাজ করতে করতে দরজার দিকে নজর রাখছিলাম। যদি কোনো খদ্দের দোকানে ঢোকে আর এই তামাশারও অবসান ঘটে এই আশায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কোথায় খদ্দের। ফ্রিক্শন শেষ হল, এবার চাই ব্রিলিয়ান্টাইন। তাও আবার সব সেরা যেটা। সব হল। এবার চিরুনীটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিজেই চুল আঁচড়াল। কত যত্ন নিয়ে যে আঁচড়াল বলার নয়। শেষকালে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: 'এবার বেশ ভাল লাগছে।' ঘড়ির দিকে তাকালাম: প্রায় একটা বাজে। বললাম: 'রেমন্ডো, তোমার দাড়ি কামিয়েছি, চুল কেটেছি, ফ্রিক্শনও দিলাম···এবার আমায় সমুদ্রে যেতে দাও· এখনো সময় আছে।' অ্যাপ্রন খুলতে খুলতে সে শুধু বললে: 'আমি এখন খেতে বাড়ি যাচ্ছি···তুমিও বেরিয়ে গেলে দোকান কে দেখবে?··· বলেছি ত, অস্তিয়ায় সোমবার যাবে।' এই বলে জ্যাকেটটা পরে নিয়ে আমার দিকে মাথাটা নেড়ে বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন পাওলিনো। পাওলিনো আমার খাবার নিয়ে আসবে বাড়ি থেকে।

এখন আমি একা। ইচ্ছে হল, লাথি মেরে চেয়ারগুলো ভেঙে ফেলি, আয়নাগুলো চুরমার করি এবং ব্রাশ আর ক্ষুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিই রাস্তায়।

কিন্তু জিনিসগুলো যেহেতু আমার দিদির আর তাই আমারও বটে, সেহেতু রাগ চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে অপেক্ষায় বসে রইলাম। রাস্তা দিয়ে এখন কেউ যাতায়াত করছে না। চড়া রোদে বাইরেটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। দোকানের ভেতরে শুধু নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। ভুরু কোঁচকানো নিজের চেহারাটা আয়নাগুলিতে প্রতিফলিত। খিদেয় খানিকটা আর খানিকটা ওই আয়নার প্রতিফলনের ফলে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বরাত ভাল, পাওলিনো ন্যাপকিনে ঢাকা একটা প্লেট নিয়ে এসে হাজির হল। রেমনডো বাড়িতে বসে দিদির তৈরী উপাদেয় খাবার খাচ্ছে আর আমার কপালে কিনা ঠাণ্ডা এক প্লেট স্প্যাঘেটি, এক টুকরো রুটি আর ছোট এক বোতল মদ। আস্তে আস্তে খাচ্ছি। যেন সময় কাটাতে হবে, তাই। মাথায় কেবলি ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই চিন্তা। রেমনডো কী মেজাজেই না দিনগুলো কাটাচ্ছে। আর দিদিকেও বলিহারি যাই, পছন্দ করবি তো কর রেমনডোর মত একটা লোককে! খাওয়া সব শেষ হয়েছে, এমন সময় একটা গলার আওয়াজে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম : 'ভেতরে আসতে পারি?'

ঘুপচি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। দেখি সান্তিনা। উল্টো দিকের বাড়ির দারোয়ানের মেয়ে। গায়ের রংটা চাপা, হলেও শরীরের গড়নটা ভাল। সুন্দর মুখশ্রী। চালাক-চালাক দুটি চোখ। প্রায়ই সে দোকানে ঢুকে পড়ত, এটা-সেটা ছুতোনাতা করে। সরল মনে ভাবতাম, বুঝিবা আমার জন্যেই আসে। ঠিক ওই মুহূর্তে ও আসায় বেশ খুশীই হলাম। বললাম, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে কী মজাই না হত। নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, তা তো হত কিন্তু সেদিন যে আবার ওকে কাপড়-চোপড় ছাদে মেলে দিতে হবে। বললাম : 'তোমার কাজে কি একটু হাত লাগাবো?' 'আমার সঙ্গে ছাদে উঠে আসবে?' বলল ও, 'উরে বাবা, মা তাহলে নির্ঘাত আমার পেছনে লাগবে।' ঘুরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলার কিছু খুঁজছিল সে। শেষকালে বলল : 'এখানে বোধহয় খুব একটা খদ্দের-টদ্দের আসে না, তাই না? বলি : 'খুব কি বলছ? একেবারে আসে না।' 'তোমরা মেয়েদের জন্যে একটা সেলুন খোল। আমি আমার বান্ধবীদের নিয়ে আসব-টাসব।' ওর মনস্তুষ্টির জন্য বললাম : 'কতটুকু কি করতে পারবো জানিনা, তবে আমার কাছে সেণ্ট স্প্রে আছে।' শরীরে ভঙ্গিমা তুলে সঙ্গে সঙ্গে ও বলল : 'সত্যি? কি সেণ্ট বল ত?

বললাম : 'খুব ভাল সেণ্ট।' সেণ্টের শিশি তুলে নিয়ে মজা করে ওর এখানে-ওখানে স্প্রে করতে লাগলাম। ও চেঁচিয়ে বলল ওর চোখ জ্বালা করছে। হাত তুলে নিজেকে বাঁচাবার ভঙ্গি করল। ঠিক তখনি রেমন্‌ডো এসে হাজির।

'বাঃ বাঃ, চমৎকার। বেড়ে আছো দেখছি।' দুজনের কারো দিকে না তাকিয়ে রেমন্‌ডো বলল কঠোর গলায়। মাপ চেয়ে ততক্ষণে সান্‌তিনা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সেণ্টের শিশিটা আমি জায়গামত রেখে দিলাম। রেমন্‌ডো বলল : 'দোকানে মেয়েরা ঢোকে এ আমার পছন্দ নয় তুমি জানো, আর ওই সেণ্ট খদ্দেরদের জন্যে।' কেমন কৃত্রিম ভঙ্গিতে যেন সান্‌তিনা প্রতিবাদ জানাল : 'সেনর রেমন্‌ডো, আমি কোন ক্ষতিই কিন্তু করিনি।' বলে খুব একটা তাড়াহুড়ো না করে বেরিয়ে গেল। লক্ষ করলাম, মেয়েটার দিকে রেমন্‌ডো কেমন চোখে যেন তাকিয়ে রইল। দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ মেয়েটা আমার মনকে টেনেছে। তাছাড়া হঠাৎ কেমন যেন মনে হল রেমন্‌ডোও মেয়েটার মনকে টেনেছে—সান্‌তিনার প্রতিবাদের ধরনে আমার ওই কথাই মনে হল। গোমড়া মুখ করে বললাম : 'ভায়োলেট ফ্রিক্‌শন তোমার জন্যে—সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যে আমায় সঙ্গ দিয়েছে তার জন্যে একটুখানি সেণ্টও আমি খরচ করতে পারবো না?' কোন কথা না বলে জ্যাকেট খুলতে দোকানের পেছনে চলে গেল রেমন্‌ডো। এভাবেই আরম্ভ হল বিকেলটা।

ওই গরমে ঘণ্টা দুই কেটে গেল চুপচাপ। প্রথমটায় রেমনডো ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নিল। এরপর জেগে উঠে কাঁচি দিয়ে নাকের ও কানের লোম কিছুক্ষণ ধরে ছাঁটল। শেষটায় কি করবে ভেবে না পেয়ে আমার দাড়িই কামিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মুশকিল হল, ওকে কামানোর চাইতেও আমার বেশী অপছন্দ ওর হাতে কামানো। আমি সহকারী হিসেবে ওর দাড়ি কামিয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু রেমনডো আমার দাড়ি কামাবে ভাবতেই আমার খুব খারাপ লাগল। মনে হল, দুজনই আমরা একেবারে নিষ্কর্মা ছাড়া কিছু নই। কিন্তু কিছুই করার নেই দেখে ওর কথায় রাজী হলাম। আমার একগালের ফেনা সাফ করে অন্য গালটা ধরতে যাচ্ছে এমন সময় আবার রাস্তা থেকে ভেসে এল সান্‌তিনার গলা : 'ভেতরে আসতে পারি?'

দুজনেই ফিরে তাকালাম। আমার একগালে সাবান মাখা আর রেমন্‌ডোর

হাতের ক্ষুর শূন্যে তোলা এবং ওদিকে দাঁড়িয়ে সান্তিনা। এক পা দরজায় আর এক পায়ের ওপর নিংড়নো কাপড়-চোপড় ভরতি একটি ঝুড়ি। হাসি-হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে। 'কিছু মনে করবেন না,' সান্তিনা বলল, 'আপনাদের হাতে এখন ঠিক কোন কাজ নেই জেনেছি। তাই ভাবছি সেনর রেমন্ডোর গায়ে তো খুব জোর, তিনি যদি আমার এই কাপড়ের ঝুড়িটা ছাদে নিয়ে যেতে আমায় একটু সাহায্য করেন···দয়া করে কিছু মনে করবেন না।' রেমন্ডোর চেহারা তখন দেখবার মত···! ক্ষুর নামিয়ে রেখে আমায় বললে: 'সেরাফিনো, বাকিটা নিজেই কামিয়ে নাও।' বলে গায়ের অ্যাপ্রনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সান্তিনার সঙ্গে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। নিজেকে সামলে নেবার আগেই দেখি হাসি ঠাট্টা করতে করতে ছুটিতে উল্টো দিকের বাড়ির প্রবেশ পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই বুঝে ধীরে সুস্থে কামানো শেষ করলাম। মুখ-মুছে পাওলিনোকে বললাম: 'বাড়ি গিয়ে দিদিকে এক্ষুনি এখানে চলে আসতে বল্···শিগগির, দৌড়ে যা।'

একটু বাদেই দিদি এসে হাজির হল। ভয়ে তার মুর্চ্ছা যাবার যোগাড়। দিদির বেঁকে-পড়া কুৎসিত চেহারা এবং গালের ওই লাল জড়ুল জন্মদাগ—যার মধ্যে নিহিত ওর পয়সায় চালু করা এই সেলুনের গোটা কাহিনী—আমার মনে কেমন করুণা জাগিয়ে তুলল। ভাবলাম ওকে কিছুই বলব না। কিন্তু ভাবলে কি হয়, ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। তা ছাড়া রেমন্ডোর ওপর আমার প্রতিশোধ স্পৃহাও রয়ে গেছে। দিদিকে বললাম: 'ভয় পাবার মত কিছু হয়নি·· ব্যাপার হল, রেমন্ডো উল্টো দিকের বাড়ির দারোয়ানের মেয়েকে কাপড় টাঙাতে সাহায্য করতে ছাদের ওপর উঠে গেছে।' 'হা ভগবান' দিদি ডুকরে উঠল, 'এই আবার ঝামেলা শুরু হল।' বলে সোজা রাস্তার ওপারের বিরাট প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। গায়ের থেকে অ্যাপ্রনটা খুলে জ্যাকেটটা পড়ে নিলাম। খড়খড়ি নামিয়ে দিলাম। যাবার আগে ছাপানো একটা বিজ্ঞপ্তি লটকে দিয়ে গেলাম: 'পারিবারিক শোকের দরুন দোকান বন্ধ।'

□ অলংকার □

কোনও ছেলে-বন্ধুদের দলে যখন কোনো নারীর আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই দলটি যে ভেঙে যাবেই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সকলেই তখন আলাদা-আলাদা হয়ে যে যার রাস্তা দেখে। সে বছর আমরা ক'জন যুবক মিলে একটা দল গড়লাম। সকলেরই একজনের সঙ্গে অন্যের দারুণ ভাব, সব সময়ই একাত্মা আর একমত, এক সঙ্গে ওঠাবসা। রোজগারপাতি বেশ ভালই আমাদের। তোরে কাজ করে গ্যারেজে, মদেস্তি ভ্রাতৃদ্বয় মাংস ব্যবসায়ের দালালি করে, পিপ্‌পো মরগ্যাস্তি কাজ করে শূকর মাংসের দোকানে আর রিনাল্‌দো মদের দোকানে। আমার কাজ হরেক রকম। আমাদের সকলেরই বয়েস তিরিশের নীচে হলে কি হয়, ওজন কারুরই বারো-তেরো ষ্টোনের কম নয়। ছুরি কাঁটা চালাতে ওস্তাদ আমরা সবাই। দিনের বেলায় কাজকর্ম করি আর সন্ধ্যে সাতটা থেকে একত্র হয়ে গুলজার। প্রথমে করসো ভিত্তেরিয়োতে রিনাল্‌দোর মদের দোকানে, তারপর চিয়েসা নুওভার কাছাকাছি বাগানওলা একটা রেস্তোরাঁয়। বলাই বাহুল্য, রোববারটা এক সঙ্গে মিলে কাটাতাম। সেদিনটা কাটত হয় স্টেডিয়ামে বসে ফুটবল খেলা দেখে, কিংবা কাস্‌তেল্লি রোমানিতে অভিযান চালিয়ে আর তা নয়তো আস্তিয়া বা লাদিস পলির উষ্ণ আমেজ ভরা আবহাওয়া গায়ে মেখে। সব সুদ্ধ আমরা ছ'জন হলেও ছ'জন মিলে যেন একজনই ছিলাম। সুতরাং কারুর গায়ে কোনো খেয়ালের হাওয়া লাগলে তার ঢেউ এসে পড়ত অন্য সকলের গায়ে। অলংকারের খেয়ালটা শুরু করে তোরে। একদিন বিকেলে প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া সোনার স্ট্র্যাপে বাঁধা নিরেট সোনার একটা হাতঘড়ি পরে সে রেস্তরাঁয় এলো। হাতঘড়িটা ওকে কে দিয়েছে জিজ্ঞেস করলাম আমরা। জবাব এল: 'ব্যাংক অব ইটালির ডিরেক্টর দিয়েছে।' অর্থাৎ, নিজের পয়সায় কিনেছে। ঘড়িটা খুলে আমাদের সে দেখতে দিল। দেখলাম, সুপরিচিত কোম্পানীর ঘড়ি, ডবল কেসওলা, সঙ্গে সেকেণ্ডের কাঁটা। স্ট্র্যাপসুদ্ধ ঘড়িটা বেজায় ভারী, ওজন যে ঠিক কত হবে কে জানে। 'পয়সাটা কাজে লেগেছে', কে যেন বলল। তোরে কিন্তু মুখিয়ে উঠল: 'কাজে লেগেছে? কাজে

লাগালাগির কি আছে? ঘড়িটা পরতে ভাল লাগছে, ব্যস্।' পরদিন যথারীতি রেস্তোরাঁয় এসে দেখি মরগ্যান্তি ওইরকম একটা ঘড়ি কিনে পরেছে। ওর ঘড়ির ষ্ট্র্যাপটাও সোনার, তবে অতটা ভারী নয়। এরপর পালা মদেস্তি ভুভায়ের—ওরা কিনল তোরের চাইতেও বড়ো সাইজের ঘড়ি। ওদের ঘড়ির ষ্ট্র্যাপগুলি কম নিরেট, কিন্তু বেশি চওড়া। রিনাল্‌দোর আর আমার দুজনেরই পছন্দ তোরের মত ঘড়ি। ওকে তাই জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম কোত্থেকে ঘড়িটা সে কিনেছে, তারপর দুজনে মিলে করসোর একটা ভাল দোকান থেকে একটা করে ঘড়ি কিনে ফেললাম।

মে মাস এসে গেছে। বিকেলে প্রায়ই ম'তে মারিওতে যাই। সেখানে একটা সরাইখানায় মদ, টাটকা বীন আর ভেড়ার দুধের পনির খাই। একদিন বিকেলে বীন নিতে হাত বাড়াতেই তোরের আঙুলে দেখি হীরে-বসান বেশ বড় একটা আংটি। 'বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর তো!' আমরা বলে উঠলাম। তোরে কিন্তু বেশ রুক্ষভাবে বলল: 'ছাখ বাঁদরের দল, আমার দেখাদেখি খবরদার আমার নকল করবি না···যাতে একটু আলাদা দেখায় সেজন্যেই এটা কিনেছি।' যাহোক আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ফেলল, আমরাও পর পর দেখলাম ওটা—হীরেটা সত্যি খুব সুন্দর, খুব স্বচ্ছ আর নিখুঁত। তোরের বেশ দশাসই চেহারা, তবে নরমতরম দেখতে। চ্যাপ্টা থলথলে মুখ, কুৎকুতে দুটো চোখ, মাখনের দলার মত নাক আর হাঁ-করা মানি ব্যাগের মত ঠোঁট দুটো। ছোটখাট চ্যাপ্টা আঙুলে ওই আংটি এবং বেঁটে মোটা কবজিতে ওই হাতঘড়ি দেখে ওকে কেমন মেয়ে মেয়ে মনে হচ্ছিল। ওর কথামত আমরা অবশ্য হীরের আংটি পরলাম না, তবে সুন্দর দেখে প্রত্যেকেই একটা করে আংটি কিনে নিলাম। মদেস্তি ভাইয়েরা দুজনে একই রকম সোনার আংটি কিনলেও তার একটা পাথর সবুজ অন্যটা নীল। রিনাল্‌দো কিনল মোটামুটি পুরনো ধাঁচের একটা আংটি, একটি সাদা নগ্ন নারীমূর্তি খোদাই করা একটা দামী বাদামীরঙা পাথর তাতে আছে। আর মরগ্যান্তি যথারীতি সকলকে তাক লাগিয়ে দিল কালো পাথর-বসানো খাঁটি প্ল্যাটিনামে-তৈরী একটা আংটি কিনে। আমি অত আধুনিক নই। আমি কিনলাম একটা চৌকো মতন আংটি। তাতে চ্যাপ্টা হলুদ রঙের একটা পাথরে নিজের নামের আদ্যক্ষর খোদাই করিয়ে নিলাম। যাতে এ দিয়ে আমার পার্শেল সীল করার কাজও চলে যায়। আংটির পর এল

সিগারেট কেসের পালা। এবারও তোরেই প্রথম শুরু করল ব্যাপারটা। চ্যাপটা লম্বা একটা কেস বার করল তোরে। কেসটা সোনার তৈরী বলাই বাহুল্য। ফট্ করে সেটা একেবারে আমাদের নাকের ডগার কাছে খুলে ফেলল। তোরেকে আমরা সকলেই নকল করি। কেউ একভাবে কেউ অন্যভাবে। সিগারেট কেসের পর আমরা যে যার খেয়াল খুশি মাফিক জিনিস কিনতে লাগলাম। কেউ কিনি কব্জিতে পরার জন্য মেডেলযুক্ত ব্রেসলেট। কেউ কেনে চাপ নিয়ন্ত্রিত ফাউন্টেন পেন, কেউ বা কেনে গলায় পরার জন্য মেরী মাতার পদক ও ক্রুশযুক্ত চেন। আবার কেউ কেনে সিগারেট লাইটার। তোরে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দেমাকী—সে আরো তিনটে আংটি কিনে ফেলল। এতে ওকে আরো মেয়ে-মেয়ে মনে হতে লাগল। বিশেষ করে জ্যাকেট খুলে ছোট হাতার শার্টে ওর বড় বড় নরম নরম হাত আর নানান আংটি পরা আঙুল যখন চোখে পড়ত তখন তোরেকে মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবা যেত না।

আমরা এখন সকলেই অলংকারে মণ্ডিত। কিন্তু কেন জানি না ঠিক তখনই সবকিছু গোলমেলে ঠেকতে লাগল। বিশেষ কিছু না—এই একটুখানি পেছনে লাগা, কিছু কটু-কাটব্য, কয়েকটা কড়া কড়া জবাব। এরপর একদিন বিকেলে রিনাল্‌দো তার নতুন ক্যাশিয়ার মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের রেস্তোরাঁয় এসে হাজির। মেয়েটির নাম লুক্রেজিয়া। বয়েস বছর কুড়ি হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ত্রিশ বছরের রমণীর মতই পূর্ণ বিকশিত। দুধের মত সাদা গা, বড় বড় কালো চোখদুটি স্থির ও ভাবলেশহীন, ঠোঁটদুটি লাল আর কুচকুচে কালো চুল। অবিকল মূর্তির মতই দেখতে মেয়েটি। চুপচাপ স্থিরভাবে বসে ছিল সারাক্ষণ। রিনালদো আমাদের চুপিচুপি জানাল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেয়েটিকে সে কাজে বহাল করেছে। মেয়েটি সম্পর্কে ওর কিছুই জানা নেই। ওর পরিবার বলতে কে আছে কিংবা কার সঙ্গেই বা সে থাকে সবই রিনাল্‌দোর অজানা। তবে ক্যাশে বসার উপযুক্ত মেয়ে সে, রিনাল্‌দো জানাল। সুন্দর চেহারায় খদ্দেরের মন টানে আবার গম্ভীর ভাবভঙ্গির ফলে ওর বেশি কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না কেউ। সাদামাটা চেহারার হলে খদ্দের আসে না। আবার ফুটফুটে কিন্তু ছটফটে হলে কাজকর্মের অসুবিধা। সেদিন বিকেলে লুক্রেজিয়ার উপস্থিতির দরুন খুব সমঝে চললুম আমরা। গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে সবসময় ঠায় বসে

রইলুম। খুব সংযত ভাবে কথাবার্তা বললুম। কোনরকম বাজে ঠাট্টা তামাসা না করে খুবই ভদ্রভাবে খাওয়া সারলুম। এমন কি তোরে যে তোরে, সেও কি না ফল খেতে ছুরি কাঁটা বাগিয়ে ধরলে। যদিও তাতে খুব সুবিধে হল না। পরদিন কর্মরত লুক্রেজিয়াকে দেখার জন্যে সবাই আমরা মদের দোকানে ছুটলুম। ছোট্ট একটা টুলের ওপর লুক্রেজিয়া বসে। বয়সের তুলনায় বাড়-বাড়ন্ত ওর পাছাটি টুলের দুধারে বেরিয়ে এসেছে। এবং ওর উদ্ধত বুক ক্যাশ রেজিষ্টারের চাবি প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে। আমরা সকলেই একেবারে হাঁ হয়ে দেখছিলাম ওকে। খুব ধীরস্থীরভাবে, খুব নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছিল লুক্রেজিয়া। একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না। দোকানের কাউণ্টারের দিকে সোজাসুজি স্থির-নিবদ্ধ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে শুধু তার শান্ত নির্লিপ্ত স্বর শোনা যাচ্ছে: 'দুটো কফি···একটা অরেঞ্জ·····একটা বিয়ার।' মুখে হাসি নেই, একবারো খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে দেখছে না। ও একটু তাকাক এই আশায় কোনো কোনো খদ্দের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াচ্ছে। লুক্রেজিয়ার সাজসজ্জা শোভন, তবে গরীব ঘরের মেয়ে বোঝা যায়। পরনে সাদাসিদে সাদা স্লীভলেস পোশাক। কিন্তু বেশ ছিমছাম। গায়ে কোনরকম গয়নাগাটি নেই। কানের লতি ফুটো হলেও ইয়ারিং পরা নেই। চেহারার চটকটা চোখে পড়তেই ঠাট্টা-তামাসা শুরু হল আমাদের। রিনাল্‌দো উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটাকে নিয়ে নিয়ে ওর ভারি গর্ব। কিন্তু কিছুক্ষণ ঠাট্টা-তামাসা চলবার পরই লুক্রেজিয়া বলে উঠল: 'আজ বিকেলেই ত রেস্তোরাঁয় আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই না? এখন আমাকে একা থাকতে দাও··কাজ করার সময়ে গণ্ডগোল করাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।' কথাগুলো তোরেকে উদ্দেশ্য করে বলা, কারণ ও-ই অসভ্যতা করছিল বেশী। তোরে অবাক হবার ভান করে বলল: 'সত্যি আমি দুঃখিত··আমরা গরীব গরবা লোক, রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলা কি আমাদের শোভা পায়···সত্যি বলছি দুঃখিত· আঘাত করার কোন রকম ইচ্ছেই ছিল না আমাদের।' বিরস গলায় জবাব দিল লুক্রেজিয়া: 'আমি রাজকুমারী টুমারী নই, খেটে-খাওয়া গরীব ঘরের মেয়ে আমি···তাছাড়া আমি আঘাত টাঘাতও পাইনি···একটা কফি··' অপমানিত বোধ করে চলে এলাম আমরা।

বিকেলে যথারীতি রেস্তোরাঁয় মিলিত হলাম সকলে। রিনাল্‌দো আর

লুক্রেজিয়া এল সবার পরে। ওরা আসতেই ডিনারের অর্ডার দিলুম। খাবারের প্রতীক্ষা ভরা মুহূর্তগুলি কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকানের মালিক একটা বড় ডিশ ভরতি মুরগির মাংসে তৈরী খাবার নিয়ে এল। মাংস টুকরো করে কাটা, সঙ্গে টমেটো সস্‌ ও লংকা। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। এবং তোরে আমাদের মনোভাবের প্রতিনিধি হিসেবে বলে উঠল: 'আমার কথা কি জানিস তো? খাবার সময় খোলা মেলা মন নিয়ে খাওয়া চাই·· তোরাও তাই করে দেখ, ভাল লাগবে।' বলতে বলতে মুরগির একটা ঠ্যাং তুলে নিল সে এবং আংটি পরা দুহাতে ঠ্যাংটা মুখে পুরে মহানন্দে খেতে লাগল। এটা সংকেত। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আমরাও খাবারে হাত লাগালাম। রিনাল্‌দো এবং বলাই বাহুল্য লুক্রেজিয়া এতে যোগ দিল না। লুক্রেজিয়া ছোট্ট এক টুকরো মাংস তুলে আলগোছে কামড় বসাল। গোড়াকার ইতস্তত ভাব কাটিয়ে উঠে আমরা আগেকার মতই হই হুল্লোড়ে মেতে উঠলাম। কথা বলতে বলতে খাচ্ছি, আবার খেতে খেতে কথা বলছি। মুখে খাবার পুরে ঢক ঢক করে মদ খেলাম। গা এলিয়ে দিলাম চেয়ারে। মুখরোচক গালগল্প চলল। আমাদের বেপরোয়া ভাবের জন্যেই বোধহয় আমরা সেদিন বাড়াবাড়ি করলাম খুব বেশি রকম। এবং ওই দিন বিকেলে যতটা খাবার যেমন আনন্দ করে খেলাম এমনটা আর কখনো খেয়েছি বলে তো মনে হয় না। ডিনার শেষ হবার পর তোরে প্যান্টের বকলস খুলে বিরাট একটা ঢেঁকুর তুলল: 'আহ, তোফা লাগছে মাইরি।' একটা দাঁত খোঁচাবার কাঠি নিয়ে তোরে যথারীতি একটার পর একটা দাঁত খুঁচিয়ে চলল। শেষে মুখের এক কোণায় কাঠিটা আটকে রেখে একটা অশ্লীল গল্প শোনাল। লুক্রেজিয়া এবার উঠে দাঁড়াল, বলল: 'রিনাল্‌দো, বড্ডো ক্লান্ত লাগছে · কিছু মনে না করলে আমায় বাড়িতে পৌঁছে দেবে?' আমরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলাম। মেয়েটা দুদিনও হয়নি রিনাল্‌দোর ক্যাশিয়ার হয়েছে আর এর মধ্যেই নাম ধরে রীতিমত অন্তরঙ্গ স্বরে কথা কইছে! কাগজে বিজ্ঞাপনের ব্যাপার বই কি! ওরা চলে গেল। চলে যাওয়া মাত্র তোরে আরেকটা ঢেকুর তুলল। তারপর বলল: 'ব্যাপারটা দেখলি···দেখলি ত মেজাজটা? আর রিনাল্‌দোকেও বলিহারি—কেমন ভেড়ার মত পেছন পেছন গেল? কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়েছিল না হাতি, আসলে ওটা ছিল পাত্রী চাইর বিজ্ঞাপন।'

দুদিন ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলল। নীরবে শান্তভাবে খাচ্ছে লুক্রেজিয়া আর আমরা এমন ভাব করছি যেন ওর কোনো অস্তিত্বই নেই। রিনাল্‌দো একবার লুক্রেজিয়ার দিকে আরেকবার আমাদের দিকে ঝুঁকছে—ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কোন দিকে যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কিছু একটা ঘটছে সেটা সকলেই আঁচ করলাম। মেয়েটা গভীর জলের মাছ, বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে দিলে না। তবে রিনাল্‌দো তার আর আমাদের মধ্যে যাহোক একটা বেছে নিক এটা যে চাইছে সেটা বোঝা গেল। শেষটায় একদিন বিকেলে সবে আদ্দেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই রিনাল্‌দো আমাদের আক্রমণ করে বললে: 'তোমাদের সঙ্গে এই-ই আমার শেষ খাওয়া' আমরা তো অবাক। তোরে শুধোল: 'তাই নাকি? কিন্তু কারণটা কি, জানতে পারি কি?' 'তোদের বরদাস্ত হয় না তাই।' 'আমাদের বরদাস্ত হয় না? এজন্যে আমরা খুব দুঃখিত · সত্যিই দারুণ দুঃখিত।' 'তোরা একটা শূয়োরের দল, বুঝেছিস, এছাড়া আর কিছু বলা যায় না।' 'ছাখো, মুখ সামলে কথা বলো · কিন্তু, ব্যাপারটা কী, মাথাটাথা খারাপ হলো না কি তোর?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছি ঠিক তাই। তোরা আস্ত শূয়োরের দল ··কথাটা বলেছি, বলছি, আবারো বলব·· তোদের সঙ্গে বসে খেতে আমার ঘেন্না হয়।' ততক্ষণে রাগে আমাদের মুখ লাল হয়ে গেছে, কেউ কেউ খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়েছে। তোরে মুখ খুলল: আসলে তুই-ই সকলের চেয়ে বড় শূয়োর একটা। আমাদের সম্পর্কে কথা বলার অধিকার কে দিলে তোকে? এদ্দিন আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি নি? একই কাজ করিনি সকলে?' 'তুমি চুপ কর।' রিনাল্‌দো ধমকে উঠল, 'ওই অত সব গয়না গাটিতে তোকে ত দেখায় একটা বিশেষ ধরনের মেয়েছেলের মত—কোন্ ধরনের সেটা বুঝিয়ে বলতে হবে না আশাকরি···শুধু একটুখানি সেণ্ট হলেই হয়···সত্যি, তোর সেণ্ট-টেণ্ট মাখার কথা মনে হয়নি কখনো?' আক্রমণটা যে আমাদের সকলকে লক্ষ্য করে সেটা বুঝতে কষ্ট হল না। এবং এই আক্রমণের উৎস কোথায় সেটাও বুঝতে বাকি রইল না। সবাই একসঙ্গে তাকালাম লুক্রেজিয়ার দিকে। কিন্তু সে ছল করে রিনাল্‌দোর জামার হাতা ধরে টানছিল এবং বলছিল ঝগড়া না করে চলে আসতে। তোরে তখন বলল: তোমারও নেই তা নয়···তোমার যে একটা ঘড়ি, একটা আংটি একটা বালা আছে সেকথা

ভুলো না·· আমাদেরও তাই আছে।' রিনাল্‌দোর মেজাজ এবার সপ্তমে চড়ল। চীৎকার করে বলল: 'এগুলো কি করবো জানো? এগুলো সব খুলে ওকে দিয়ে দেবো···এসো তো লুক্রেজিয়া, এগুলো তুমি নাও, আমি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে সে হাতের আংটি ঘড়ি বালা খুলে ফেলল, পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে ফেলল এবং সবগুলো জিনিস মেয়েটার কোলে ফেলে দিল। এরপর সে অপমানকর ভঙ্গিতে বলল: 'তোমাদের কেউ কিন্তু একাজ করবে না·· করতে পারবে না।' 'জাহান্নামে যাও তুমি,' তোরে বলল। কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যায় ওই সব অলংকার নিয়ে এখন সে বিব্রত। 'রিনাল্‌দো', শান্তস্বরে বলল লুক্রেজিয়া, 'তোমার জিনিসগুলো তুলে নাও। চলো আমরা চলে যাই।' রিনাল্‌দোর দেওয়া জিনিসগুলো একত্র করে ওর পকেটে সে পুরে দিল। আমাদের ওপর যে কোনো কারণেই হোক খাপ্পা হয়ে থাকার দরুন লুক্রেজিয়া ওকে টেনে নিয়ে যাবার সময়ও রিনাল্‌দো সমানে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছিল: 'বলেইছি ত, শূয়োরের দল তোমরা···কেমন করে খেতে হয় তা জানো?···কেমন করে বাঁচতে হয় শিখেছ কখনো?···শূয়োর যত।' 'আহাম্মক,' রাগে ফেটে পড়ল তোরে, 'নপুংসক কোথাকার·· আরেকটা আহাম্মক তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আবার বড় বড় কথা।' দুজনকে ছাড়িয়ে দিলাম আমরা।

দুদিন বাদে দেখা গেল কারো হাতেই কোনো অলংকার নেই। সবাই কেমন ম্যারমেরে লাগছে। এই করে এক হপ্তা গড়িয়ে গেল। এরপর কোন না কোন অজুহাতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সবই শেষ হয়ে গেল। এবং সকলেই জানেন, একবার শেষ হয়ে গেলে। আর তা শুরু হয় না—ভাঙা হাঁড়ি আর জোড়া লাগে না। পরে শুনতে পেলাম, রিনাল্‌দো লুক্রেজিয়াকে বিয়ে করেছে। এও শুনলাম, গির্জেয় লুক্রেজিয়া এত গহনায় সেজেছিল যে ম্যাডোনার মূর্তিকেও হার মানায়। আর তোরে? এই কিছুদিন আগে দেখা হল ওর সঙ্গে গ্যারাজে। ওর আঙুলে একটা আংটি পরা ছিল বটে, কিন্তু আংটিটা না সোনার না কোনও হীরে ছিল তাতে।

☐ সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়ে ☐

অধ্যাপক মশায় যখন জেদ ধরে বসলেন যে সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়েই তাঁর চাই, তখন তাঁকে আমি বোঝালুম : 'দেখুন স্যার, ওরা কিন্তু বড্ডো সোজা সরল ধরনের মেয়ে···একেবারে গাঁইয়ে যাকে বলে···আরেকবার ভাল করে ভেবে দেখুন···আমি বলি তার চেয়ে আপনি বরং একটা রোমেরই মেয়ে দেখেটেখে নিন···সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়েরা খাঁটি পাড়াগাঁর, নিরক্ষর চাষাভুষা শ্রেণীর মেয়ে।' শেষের বিশেষণটাই সব থেকে মনে ধরল স্যারের। বললেন, 'নিরক্ষর · আরে, তাই তো আমি চাই হে···রাজ্যের ছাইপাশগুলো ত তাহলে আর পড়বে না বসে বসে· ·নিরক্ষর।' অধ্যাপক মশায় বুড়ো মানুষ। মুখে ছুঁচলো সাদা দাড়ি আর গোঁফ। হাইস্কুলে পড়ান। তবে আসলে তিনি ব্যস্ত থাকতেন প্রাচীন ভগ্নাবশেষ নিয়ে। প্রতি রোববার ছাড়া অন্যান্য দিনেও তিনি বেরিয়ে পড়তেন এখানে-ওখানে রোমের পুরাকীর্তির কথা বুঝিয়ে বলতেন। তাঁর নিজের ঘরে পুরাকীর্তি বিষয়ক এবং অন্যান্য বইপত্র বইয়ের দোকানের মতই স্তূপীকৃত থাকত। সামনের ঘরে সবুজ পর্দার আড়ালে ছিল অসংখ্য বইপত্র, তাছাড়া বাথরুম ও রান্নাঘর বাদে সর্বত্র বইয়ের ছড়াছড়ি। তাঁর কাছে তাঁর বই ছিল গোলাপ ফুলের গন্ধের মতই দামি। কেউ সেই বই ছুঁলে আর রক্ষে নেই। এত বইয়ের সবই তিনি পড়েছেন এমন অসম্ভব। তবু তাঁর কাছে এই বই যথেষ্ট নয়। অধ্যাপনা, বাড়িতে পড়ানো বা ভগ্নাবশেষ বিষয়ে বোঝা-নোর কাজ হাতে না থাকলে তিনি চলে যাবেন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে, আঁতিপাতি করে খুঁজে বেশ কিছু বই বগলদাবা করে চলে আসবেন। ছোট ছোট ছেলেরা যেমন ডাকটিকিট সংগ্রহ করে তেমন ছিল তাঁর বই সংগ্রহের বাতিক। কিন্তু কেন যে তিনি আমার গাঁয়ের মেয়েকেই তাঁর ঝি করতে চান, এটা আমার কাছে দুর্বোধ্য। তিনি বললেন, ওরা নাকি ঢের বেশি সৎ আর আজে বাজে চিন্তা থেকেও মুক্ত। লাল আপেলের মত গাল ওইসব কৃষক রমণীদের দেখলেও নাকি তাঁর দিনটা ভাল যায়। তাছাড়া রাঁধতে জানে ওরা। শেষকালে রাতদিন ওই সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়ের কথা শুনে শুনে আর

থাকতে না পেরে দেশে আমার ধর্মপিতাকে লিখলুম এ সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি জানালেন, ঠিক এমন একটা মেয়েরই খোঁজ আছে তার কাছে। ভ্যালেকরসার কাছাকাছি থাকে। নাম টুডা। বয়েস এখনো কুড়ি হয়নি। তবে কি না, ধর্মপিতা লিখলেন, একটা দোষ আছে টুডার। সে লিখতে পড়তে জানে না। জবাবে লিখলাম, এমন একটি নিরক্ষর মেয়েই খুঁজছেন অধ্যাপক মশায়।

ধর্মপিতার সঙ্গে টুডা এক সন্ধ্যেবেলায় রোমে এসে হাজির হল। আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। এক নজর তাকাতেই বুঝলাম টুডা সিয়োসিয়ারিয়ার একেবারে আসল জিনিস। এরা একটানা মাটি কুপিয়ে যাবে, দম নিতেও একবার থামবে না। কিংবা মস্ত বোঝা মাথায় নিয়ে পাহাড়ী রাস্তায় অনায়াসে নামা-ওঠা করবে। লাল লাল গাল মেয়েটার, অধ্যাপক যেমনটি চেয়েছিলেন। খোঁপা বাঁধা এক গোছা লম্বা চুল। কালো জোড়া ভুরু। গোলগাল মুখখানা। হাসলে ছোট ছোট শাদা দাঁত চোখে পড়ে। সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়েরা তাদের দাঁত বিশেষ এক ধরণের পাতা দিয়ে মেজে এরকম পরিষ্কার রাখে। সিয়ো-সিয়ারিয়ার একেবারে নিজস্ব ঢঙে অবশ্য ও বেশভূষা করেনি। তবে হাঁটার ধরনে সিয়োসিয়ারিয়া মেয়ের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। খুরহীন জুতোয় দৃঢ়ভাবে পা রেখে হাঁটে। এবং চটির স্ট্র্যাপ বাঁধা সুপুষ্ট পায়ের ডিম সুন্দর দেখায়। টুডার হাতে ছোট্ট একটা ঝুড়ি, সেটা নাকি আমার জন্যে। ঝুড়িতে টাটকা এক ডজন ডিম। ডিমগুলো খড় দিয়ে মোড়া ও ডুমুর পাতায় ঢাকা। টুডাকে বললাম ডিমগুলো অধ্যাপককে দিতে। এতে অধ্যাপকের ওর সম্পর্কে ভাল ধারণা হবে। কিন্তু অধ্যাপকের কথা ভেবে তো সে ডিমগুলো আনেনি। কারণ যে কোন ভদ্রলোকের মত অধ্যাপকেরও মুরগি আছে নিশ্চয়ই। শুনে আমি হাসতে শুরু করলাম। ট্রামে যেতে যেতে এটা-সেটা কথা বলেই বুঝতে পারলাম, মেয়েটা একেবারেই গাঁইয়া। সে ট্রেন দেখেনি, ট্রাম দেখেনি, সাত তলা বাড়ি দেখেনি কখনো। নিরক্ষরই বটে,—অধ্যাপক মশায় যেরকমটি চাইছিলেন।

বাড়িতে পৌছে টুডাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। এরপর লিফ্‌টে করে উঠে চলে এলাম অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে। অধ্যাপক নিজেই দোরটা খুলে দিলেন, চাকর বাকর তাঁর ছিল না। আমার স্ত্রীই তাঁর ঘরদোর সাধারণত

সাফ সুতরো করে দিত, রেঁধে বেড়েও দিত। ঘরে ঢুকে টুডা অধ্যাপকের হাতে ঝুড়িটা তুলে দিয়ে বললে: 'এই যে স্যার, আপনার জন্যে কয়েকটা টাটকা ডিম এনেছি।' অধ্যাপক টুডাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলেন। বেশ বড়সড় ঘর। ঘরে আছে একটা গ্যাস কুকার, অ্যালুমিনিয়ামের সস্‌প্যান, এছাড়া রান্নাবান্নায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জাম। টুডাকে অধ্যাপক দেখিয়ে দিলেন কেমন করে ওসব ব্যবহার করতে হয়। চুপচাপ মন দিয়ে সব শুনল টুডা। তারপর ওর গমগমে গলায় ঘোষণা করল: 'রান্নাটান্না করতে আমি জানি নে।'

একটু হকচকিয়ে গিয়ে অধ্যাপক বললেন: 'তার মানে? আমি তো শুনেছিলাম, রাঁধতে টাধতে জানো তুমি।'

টুডা বলল: 'গাঁয়ের বাড়িতে কাজ-টাজ আমি করেছি⋯মাঠে মাটি কুপিয়েছি। রান্নাটান্না একটু-আধটু করেছি বটে, সে নেহাত পেটে কিছু দিতে হবে তাই⋯এমনধারা রান্নাঘর-টর আমি দেখিনি কখনো।'

'তবে রান্নাটা করতে কোথায়?'

'কেন, আমাদের ঘরে।'

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে অধ্যাপক বললেন: 'আমরাও এই ঘরে রান্না করি, আমরাও পেটে কিছু দেবার জন্যেই রান্না করি⋯এখন ধরো আমার পেটে কিছু দেবার জন্য রান্না করতে হবে তোমাকে, কি করবে তুমি?'

একটু হেসে টুডা বলল: 'ম্যাকারোনি আর বীন দিয়ে রেঁধে দেব⋯তারপর এক গেলাস মদ⋯তারপর,⋯ও হ্যাঁ, কয়েকটা বাদাম, কিংবা কয়েকটা শুকনো ডুমুর।'

'ব্যস্? এরপর আর কিছু থাকবে না?'

'এর পর? এর পর আবার কী?'

'এই ধরো, মাছ বা মাংস?'

একথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠল টুডা। বলল: 'প্লেট ভরতি ম্যাকারোনি আর বীন দিয়ে খাবার পর আর কিছুর দরকার হয় না কি?⋯এক প্লেট ম্যাকারোনি আর বীন রুটি দিয়ে খেয়ে সারাদিন আমি মাটি কোপাতুম⋯আর তুমি তো কাজ কর্ম কিছুই করো না গো।'

'কাজ করি বইকি। পড়াশুনো করি, লিখি। কাজ করি না?'

'ওঃ পড়াশুনো, ওটা কোন কাজ নয়···আমরা যা করি সেটাই সত্যিকারের কাজ।'

যাহোক রুটি ম্যাকারোনি আর বিনের পর আরো কিছু খাবার দরকার থাকতে পারে, এটা মানতে কিছুতেই রাজী হল না টুডা। অনেক কথার পর স্থির হল, আমার স্ত্রী এসে টুডাকে কিছু কিছু রান্না শিখিয়ে যাবে। এরপর ঝির থাকবার ঘরে নিয়ে এলাম ওকে। চত্বরমুখী একটা বেশ ভাল ঘর। ঘরে বিছানা, দেরাজ আলমারি এবং ওয়ারড্রোব। ঘরে ঢুকে চারদিকে নজর বুলিয়েই টুডার প্রশ্ন: 'একা শুতে হবে না কি আমাকে ?

'আর কে শোবে তোমার সাথে ?'

'বাড়িতে আমরা তো পাঁচজন একটা ঘরে শুই।'

'এ ঘরটা কিন্তু শুধু তোমারই জন্য।'

চলে আসার আগে টুডাকে বলে এলাম খুব মন দিয়ে ভাল ভাবে কাজকর্ম করতে। আমার দায়িত্ব দুদিকে—অধ্যাপকের কাছে এবং আমার অনুরোধে টুডাকে পাঠিয়েছেন যিনি, সেই ধর্মপিতার কাছেও। বেরিয়ে আসতে আসতে শুনি অধ্যাপক টুডাকে বলছেন: 'শোনো, এই সমস্ত বইপত্র রোজ ঝেড়ে মুছে পরিস্কার রাখবে।' শুনলাম টুডা বলছে: 'এত সব বই দিয়ে কি করো গো তুমি ? কি হয় এ দিয়ে ?' জবাবে অধ্যাপক বললেন: 'বাড়ীতে থাকতে কোদাল দিয়ে যা তুমি করতে, বই দিয়ে আমি তাই করি···কাজ করি।' 'তা না হয় হল,' টুডা বলল, 'কিন্তু, আমি তো মোটে একটা কোদাল দিয়ে কাজ করতুম !'

সেদিন থেকে প্রায়ই অধ্যাপক আমার ঘরে এসে টুডার খবরাখবর দিয়ে যেতেন। দেখলাম আগের মত তিনি আর টুডার ওপর তেমন প্রসন্ন নন। একদিন তো বলেই ফেললেন: 'মেয়েটা বাস্তবিকই একেবারে চাষাড়ে, বুঝলে ·· কাল সে কি করেছে জানো ? টেবিল থেকে আমার ছাত্রের লেখা একটা পাতা তুলে নিয়ে মদের বোতলের ছিপি বানিয়েছে।' বলি: 'স্যার, আগেই কিন্তু বলেছিলুম গাঁয়ের বাইরে কোনদিন পা দেয়নি মেয়েটা।' স্যার বললেন: 'তা বটে। তবে মেয়েটার ওপর বড্ডো মায়া পড়ে গেছে হে···বড়ো ভালো মেয়ে বড়ো বাধ্যের···খুবই মায়া পড়ে গেছে।'

অধ্যাপক মশায়ের সেই ভালো মেয়েটি দিন কয় যেতে না যেতেই আর

পাঁচটা মেয়ের মতই হয়ে গেল। প্রথম দিকে মাইনে পেয়েই এমন পোষাক করে ফেলল যাতে রীতিমত সম্ভ্রান্ত যুবতীর মত দেখায় তাকে। এরপর উঁচু খুরওলা জুতো কিনল। তারপর কিনল একটা হাত ব্যাগ। ওর ওই লম্বা চুল কেটে ফেলল। তবে লাল লাল গাল ছুটো তখনো আপেলের মতই সুন্দর —শহুরে মেয়েদের মত অত তাড়াতাড়ি ফ্যাকাশে হবার নয়। টুডার আপেল গাল ছুটো তখনো রীতিমত আকর্ষণীয়—শুধু অধ্যাপকেরই নয়, অন্যদের কাছেও। চারতলার মহিলাটির মোটর ড্রাইভার মারিও হতভাগার সাথে যেদিন টুডাকে দেখলাম, সেদিনই মেয়েটাকে ডেকে বললাম: 'ত্যাখো টুডা, মারিও মোটেই সুবিধের লোক নয় · যেসব কথা তোমাকে সে শোনায়, সেসব তার আর সব মেয়ে বন্ধুদেরও সে বলে থাকে।' জবাবে টুডা বলল: 'কাল গাড়িতে করে ও আমাকে ম'তে মারিওতে নিয়ে গিয়েছিল।' 'তাতে হলো কী?' 'গাড়িতে চেপে বেড়াতে মজা লাগে না? তাছাড়া এই ত্যাখো না সে আমায় কি দিয়েছে।' বলে ছোট একটা হাতি বসানো ধাতুর তৈরি একটা পিন দেখাল টুডা। এ ধরনের পিন ক্যামপো দি ফিওরিতে ফিরিওলারা বিক্রি করে। বললাম: 'তুমি একেবারে বোকা। এটা বুঝছো না, ও তোমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে···তাছাড়া তোমাকে নিয়ে খেয়াল খুশিমত ওর তো গাড়ি করে বেরনো উচিতই নয়···সেনোরা জানতে পারলে ওর কপালে দুঃখ আছে · কাজেই সাবধান হও, এখন থেকে সাবধানে চলো।' আমার কথা শুনে টুডা একটু হাসল। এবং মারিওর সাথে ওর বেড়ানো যথারীতি চলতে থাকল।

দিন পনেরো কেটে গেল। একদিন অধ্যাপক মশায় আমাদের ঘরে এসে আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন: 'আচ্ছা গিয়োভান্নি, মেয়েটা ত বেশ সৎ, তাই না?' বলি: 'নিশ্চয়ই স্যার, বোকা বটে তবে সৎ যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' 'হবে ও বা,' অধ্যাপক মশায় বললেন, 'কি জানো, পাঁচ-পাঁচটা আমার দামী বই খুঁজে পাচ্ছি না···অবিশ্যি তাই বলে আমি ·' প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম: 'বই টুডা কখনো নেয় নি, বই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' মুখে একথা বললেও মনটা খচখচ করতে লাগল। ঠিক করলুম চোখ খোলা রাখতে হবে। কয়েকদিন বাদে টুডাকে দেখলুম মারিওর সঙ্গে লিফ্‌টে ঢুকছে। মারিও বলল তার নাকি চারতলায় যাওয়া দরকার সেনোরা কোথায় যাবেন না যাবেন জেনে আসতে। কথাটা মিথ্যে। কারণ ঘণ্টা খানেক

আগেই সেনোরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এটা মারিওর অজানা নয়। ওদের যেতে দিলাম। এরপর লিফ্‌ট ধরে সোজা অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে চলে এলাম। দরজাটা ওরা আধখোলা রেখে ভেতরে ঢুকেছিল। তাই প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম পড়ার ঘরে দুটিতে কথা বলছে। বুঝলাম আমার ভুল হয়নি। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দরজার ভেতরে উঁকি দিয়ে তো আমার চক্ষু স্থির। বুককেসের গায়ে লাগানো চেয়ারটায় দাঁড়িয়ে মারিও ছাদ ছুঁই ছুঁই একসার বইয়ের দিকে তার হাত বাড়িয়েছে। আর লাল লাল গাল খুদে সন্তটি মারিওর চেয়ারটা ধরে আছে এবং বলছে : 'ও-ই ওপরে···ওই সুন্দর বড় বইটা·· চামড়ার বাঁধাইওলা সুন্দর বড় বইটা।'

ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বললাম : 'বাঃ বাঃ, টুডা তারপর মারিও··· এবার কিন্তু ধরা পড়ে গেছো · সেদিন স্যার যখন বললেন তখন ঠিক বিশ্বাস করিনি···বাঃ বাঃ চমৎকার।'

জানালা দিয়ে গায়ে এক বালতি জল ছুঁড়লে বেড়ালের অবস্থাটা কেমন হয়, দেখেছেন কখনো ? অবিকল তেমনি ভাবে লাফ দিয়ে নেমেই দৌড়ে পালাল মারিও। টুডা আর আমি তখন একা ঘরে। টুডাকে তখন অ্যায়সা দুকথা শুনিয়ে দিলুম যে অন্য মেয়ে হলে কেঁদে কেটে একসা হত। কিন্তু সিয়ো-সিয়ারিয়ার মেয়েদের ওতে কিছু হয় না—ওরা অন্য ধাতুতে গড়া। মাথা নীচু করে নীরবে সব আমার সব কথা শুনল টুডা। তারপর মুখ তুলতে দেখি চোখে জলের নাম গন্ধও নেই। বলল : 'স্যারের জিনিস চুরি করেছে কে ? বাজার ফেরতা পয়সা করি সব সময়ই কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিই ··তাছাড়া আর সব রাঁধুনির মত ডবল খরচাও দেখাই না কখনো।'

'ওরে হতভাগা মেয়ে, বই চুরি করছিলিস না তুই ? ওটা কি চুরি নয় ?'

'কিন্তু ওঁর তো ঢের বই রয়েছে।'

'ঢের থাক আর যাই থাক, একটা বইও ছোঁবে না তুমি। · ফের যদি এরকম দেখি পত্রপাঠ বিদেয় হবে তুমি, মনে থাকে যেন।'

চুরি করেছে এমন কথা কিছুতেই মানতে রাজী নয় টুডা।. কয়েক দিন বাদে দেখি টুডা এসে আমার ঘরে হাজির—একটা প্যাকেট বগল দাবা করা। বলল : 'এই যে দ্যাখো, বইগুলো ফেরত নিয়ে এসেছি—স্যারের এখন আর কিছু বলার

নেই কিন্তু।'

টুডাকে বললাম ঠিক কাজই করেছে সে। মনে মনে ভাবি মেয়েটা সত্যি ভালো, মারিও হতচ্ছাড়াই যত নষ্টের গোড়া। লিফ্‌টে করে উঠে এলাম ওপরে। দুজনে মিলে বইগুলো জায়গা মত সাজিয়ে রাখব ঠিক করে সবে মাত্র প্যাকেটটা খুলেছি, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন অধ্যাপক স্বয়ং।

বললাম: 'স্যার, এই যে আপনার সেই বই···বইগুলো টুডা ফিরিয়ে এনেছে ···ছবি দেখবার জন্য ওর এক বান্ধবীকে দিয়েছিল।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে···এ নিয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই।'

গায়ে ওভারকোট মাথায় টুপি পরা অবস্থাতেই বইগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। একটা বই টেনে নিয়ে খুলেই আর্তনাদ করে উঠলেন: 'এ বই তো আমার নয়!'

'কি বলছেন, স্যার?'

'আমার বইগুলো তো পুরাতত্ত্ববিষয়ক? একের পর এক বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন অধ্যাপক, 'এ পাঁচটা বই তো দেখছি আইনের— আর বইগুলো তো পর পর ভল্যুমের নয়।'

টুডাকে বললাম: 'এবার দয়া করে বল দিকিনি, বইগুলো কি করেছো!'

আমার এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করল টুডা। 'পাঁচটা বই নিয়েছিলুম পাঁচটা বই-ই ফিরিয়ে এনেছি, ব্যস···আর ঝামেলাটা কোথায়?···বইগুলো ফেরত আনতে মেলাই খরচ হয়ে গেছে আমার। বিক্রি করে যা পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি খরচা করেছি, হ্যাঁ।'

অধ্যাপক মশায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একবার আমার, একবার টুডার দিকে তাকালেন। টুডা বলে চলল: 'ছাখো না, বইয়ের বাঁধাই একই রকম—এমন কি আরো ভালো···তাছাড়া ওজনেও সমান। আমি ওজন করিয়ে দেখেছি— সাড়ে চার কিলো। তোমার ওই বইগুলোর ওজনও তাই ছিল।'

এবার অধ্যাপক না হেসে পারলেন না। তবে সে হাসি তিক্ততায় মেশা। বললেন: 'মাংসের মত কিলো দরে বই বিক্রি হয় না। একটা বই আরেকটা বই থেকে আলাদা··এই বই দিয়ে আমি কি করব?···দেখছো না, প্রত্যেকটা বই আলাদা বিষয় নিয়ে লেখা—আলাদা-আলাদা লেখকের লেখা?'

কিন্তু টুডাকে বোঝাবে সাধ্য কার? ওর নিজের কথাই ও বলে চলেছে:

'পাঁচটা বই নিয়েছি, পাঁচটা বই-ই ফেরত এনেছি···ওই বইগুলো বাঁধানো ছিল, এগুলোও বাঁধানো—ব্যস্, এর বেশি আমি আর কিছু জানিনা।'

কি আর করা। অধ্যাপক টুডাকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন: 'এবার রান্না করো গে, যাও। ঢের হয়েছে···আর জ্বালিও না।' টুডা চলে গেলে অধ্যাপক আমায় বললেন: 'সত্যি আমি দুঃখিত···মেয়েটা সত্যি বড্ডো ভালো, তবে একটু বেশি রকম গেঁয়ো, এই যা।'

'আপনি নিজেই কিন্তু ওকে চেয়েছিলেন, স্যার।'

'হুঁম্।' অধ্যাপক বললেন।

অধ্যাপকের কাছেই থেকে গেল টুডা। তবে আরেকটা কাজের খোঁজ করতে থাকল। শেষটায় পেয়েও গেল। ওই বাড়িতেই দুধের দোকান সাফ করার কাজ। মাঝে মধ্যে আমাদের ঘরে আসে টুডা। বইয়ের প্রসঙ্গটা কখনো তোলা হয় না। তবে সে নাকি পড়তে-লিখতে শিখছে, আমায় জানাল।

আলেসান্দ্রো একটা রেস্তোরাঁয় আমায় নাজেহাল করে। এই ঘটনার দুই দু হপ্তা পর ভিয়া ক্যাসিয়া ধরে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে যাবার সময় রাস্তায় একটা লরির সঙ্গে সংঘর্ষে সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়। গিউলিও সিনেমা দেখে হল থেকে বেরোবা মাত্র আমায় চড়-চাপড় মারতে শুরু করে। এই ঘটনার দিন তিনেক পরেই টাইবারের স্নানের জায়গায় মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে সে জলের অতলে তলিয়ে যায়। ভিয়া রিপেত্তায় দাঁড়িয়ে আমায় গাল দিয়েছিল : 'আহাম্মক গর্দভ কোথাকার!' এর কিছু পরেই ভিয়া ভেলওকার দিকে যাবার মুখে কমলার খোসার ওপর পা হড়কে গিয়ে তার উরুর হাড় ভেঙে যায়। মারিও এক ফুটবল খেলার মাঠে আমার দিকে বিচ্ছিরি একটা ভঙ্গি করে, এবং প্রায় সেই মুহূর্তেই বলতে গেলে তার পকেটমার হয়ে গেছে টের পায়। এই চারটে ঘটনায়—আরো আছে, কিন্তু একঘেমির ভয়ে সে সব আর তুলছি না—আমায় দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে সেই বছর রহস্যময় এক শক্তি রক্ষা করেছে আমায়, এবং আমার বিরুদ্ধে যে যাবে তার হয় মরণ আছে কপালে, নচেৎ কোনো দুর্ভোগ। লক্ষ করবেন, কুদৃষ্টি আছে আমার এমন কথা কিন্তু বলছি না। কারণ, কুদৃষ্টি যার আছে লোকের ক্ষতি সে করে কোনো কারণ ছাড়াই—তাতে না আছে কোনো ছন্দ, না আছে উদ্দেশ্য। সুতরাং আমার নজরটাই খারাপ একথা ঠিক নয়। আসলে যদিও আমি নেহাতই নগণ্য ব্যক্তি—দেখতে শুনতেও আহামরি নই, কিংবা গায়ে বেশ জোরটা আছে বা পয়সাওলা লোক তাও নই—তা সত্ত্বেও এক অতি প্রাকৃত শক্তি সর্বক্ষণ আমায় রক্ষা করছে এমন মনে হত। সেজন্য আমার অনিষ্ট করতে গেলেই অনিষ্ট হবে, এ আমি জানতাম। আপনারা বলবেন এ নেহাৎই কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে আমার ওপর হম্বি তম্বি করতে গিয়ে অমন মৃত্যু বা বিপদের কারণটা কি খুলে বলবেন? বলুন দেখি, যখনই কোনো বিপদে পড়ি আর সেই শক্তির স্মরণাপন্ন হই, তখনই তা কেমন করে একটা বাচ্চা কুকুরের মত সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়, আর দুষ্টের দমন করে আমায় বিপদ থেকে ত্রাণ করে! আর সবশেষে এটা বলুন

তো…যাকৃগে, কথা হল, সে সময়টায় আমার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে কোনো যাদুকরী শক্তি আমার রক্ষা কবচের মত কাজ করছে।

গ্রীষ্মের এক দিনে গ্রেজিয়া আর আমি ঠিক করলুম রোববারটা অস্তিয়ায় কাটিয়ে আসব। আমাদের বস্ত্র বিপণীতে কর্মচারী ছিলাম আমরা তিনজন: গ্রেজিয়া, আমি আর নবাগত উগো। সত্যি বলতে কি, উগো যে ধরনের লোক তাদের আমি বিশেষ পছন্দ করি না। উগো লম্বা, খেলোয়াড়ের মত দেখতে, নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। তাছাড়া মুখটা ওর বক্সারদের মত; নাকটা ভাঙা, চোয়ালটা চোখে পড়ার মত। খদ্দের এলে উগো একথান কাপড় নিয়ে কাউণ্টারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে এবং দু আঙ্গুলে চটপট থানটা খুলতে খুলতে তাকিয়ে থাকে কাচের দরজা দিয়ে রাস্তায় চলমাম পথচারীদের দিকে— খদ্দেরের দিকে তাকায় না। ওর ওই ধরনটা দেখলেই আমার কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। আর খদ্দের কাপড় দেখে খুঁত খুঁত করলে উগো তাকে বোঝাবার ধার দিয়েই যায় না, হয় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গুম হয়ে থাকে, নয়ত নীরস স্বরে সোজাসুজি বলে বসে: 'বুঝেছি, আপনি আরেকটু নিরেস ধরনের কাপড় চাইছেন।' বলে থানটা মুড়ে জায়গায় তুলে রাখে। ওর আসল উদ্দেশ্য খদ্দেরকে ভড়কে দেওয়া, আর তাতে ফলও হত। দেখা যেত খদ্দেররা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কাপড়টা আমার দেখাতে বলত আর দেখেশুনে কিনেও ফেলত। কিন্তু আমি যখনি ওকে নকল করতে গেছি—উগোর মত চেহারা আর অদ্ভুত ভাবভঙ্গি আমার ছিল না বলেই হয়ত—লোকে বলত আমার ব্যবহার খারাপ, এমনও বলত ম্যানেজারের উচিত আমার মত লোককে ছাড়িয়ে দেওয়া, এমনি আরো কত কি। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে অগত্যা আমার নিজস্ব ভঙ্গিতেই ফিরে আসি আমি। আগেকার মত সেই রকম মোলায়েম, অতি বিনীত, মিষ্টি মিষ্টি কথায় মন ভোলানোর চেষ্টাই করতে হয়।

উগোকে মোটেই পছন্দ করত না গ্রেজিয়া, আমাকে তো একথাটা বেশ কয়েকবারই সে শুনিয়েছে। 'ওই লোকটা! উফ্ বাপ্স! বিচ্ছিরি বিটকেল …একেবারে নিগ্রোর মত দেখতে।' বলেছে সে। কিন্তু আমরা অস্তিয়ায় যাবার সব রকম তোড়জোড় করার পর উগো তার স্বভাব সিদ্ধ উদ্ধত ভঙ্গিতে এসে যখন আমাদের শুধোল: 'আসছে রোববার কি করবে বলে ঠিক করলে তোমরা? গ্রেজিয়া তো হেসে ঢঙ করে আর বাঁচে না। বললে: 'উগো,

তুমিও এসো না আমাদের সঙ্গে?' উগোর অবস্থাটা তখন সহজেই অনুমেয়। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, এও বললে, আরেকটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসবে সে। যাতে আমাদের দুজনেরই সঙ্গে একটি করে মেয়ে বন্ধু থাকে। এমনভাবে কথাটা বললে যে, ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হল না। মনে হল, গ্রেজিয়াকে নিজের জন্য আর অন্য মেয়েটাকে আমার জন্য ঠিক করে রেখেছে সে।

রোববার দিন কথামত আমরা এসে মিলিত হলাম সান পাওলো ষ্টেশনে। অবিশ্বাস্য রকম ভিড় সেখানে। গ্রেজিয়ার পরনে ছিল হালকা নীল রঙা নতুন পোশাক। আমি লট বহরে ভারাক্রান্ত, দুপুরের খাবারদাবার কিনে এনেছি। উগো বেশ ফিটবাবুটি হয়ে সেজে এসেছে—পরেছে হালকা সবুজাভ ধূসর-রঙা পোশাক।

উগোর সঙ্গের মেয়েটিও এসেছে। নাম ক্লেমেন্টিনা। দোকানে যে সন্দেহটা উঁকি দিয়েছিল, মুহূর্তেই সেটা সত্য প্রমাণিত হল। উগো বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতেই গ্রেজিয়াকে বাহুলগ্ন করে ফেলল এবং ক্লেমেন্টিনা আর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল: 'দেখো, তোমরা আবার চুপিচুপি কোথাও চলে যেও না যেন··· যাবার সময় আবার তোমাদের যেন খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।' হেসে গ্রেজিয়া আহ্লাদের ভঙ্গিতে উগোর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ক্লেমেন্টিনার দিকে এক নজর তাকালাম। দেখলাম আমার উপযোগীই বটে—অর্থাৎ, আমার সম্পর্কে উগো যে ধারণাটা করে রেখেছে তেমনটি। মেয়েটা ভালোমানুষ গোছের, ফরসা ও মোটা সোটা দেখতে, বুক আর পাছা গরুর মত। বোকাসোকা মুখ-খানাও গরুর মতই—একটা ঘণ্টা শুধু গলায় ঝুলিয়ে দিলেই হয়। উগো ও গ্রেজিয়ার দিকে তাকিয়ে ক্লেমেন্টিনা আমায় বললে: 'ওরা দুজন দুজকে খুব পছন্দ করে, তাই না?' কথাটা বলার উদ্দেশ্য বোধহয় আমরাও যাতে অমনটি হয়ে উঠি। সেদিক না মাড়িয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তেতো গলায় আমি বললাম: 'তাই না কি?···কই, তেমন কিছু তো নজর করিনি।'

ট্রেন এসে পড়ল। উগো সবার আগে একটা কামরায় উঠে পড়ল। ওই অত চিৎকার চেঁচামেচি আর কথা কাটাকাটির মধ্যেও কেমন করে যে কায়দা করে ও ঢুকে পড়ল ভগবানই জানেন। শুধু তাই নয়। সবার আগে আবার তারই শ্রীমুখ উঁকি মারল জানলায়। চেঁচিয়ে বলল: 'চারটে সীট আমি

রেখেছি। তোমরা আস্তে-ধীরে উঠে এসো।' ভেতরে উঠলাম আমরা এবং মুখোমুখি বসলাম জোড়ে-জোড়ে। ট্রেন ছাড়ল। সারাটা রাস্তা আমি উগো-গ্রেজিয়া জোড়ের ওপর থেকে চোখ সরাইনি বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। চোখ আমার সরেনি তার আমি কি করব। উগো এরমধ্যেই গ্রেজিয়াকে একেবারে মুঠোয় পুরে ফেলেছে। একবার সে গ্রেজিয়ার কানে কানে কথা কইছে, গ্রেজিয়া হাসছে, লাল হয়ে উঠছে। পর মুহূর্তে আবার খেলাচ্ছলে গ্রেজিয়াকে জড়িয়ে ধরছে, তারপরেই আবার যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব করে ওকে আদর করছে। গ্রেজিয়া বেহায়া মেয়েমানুষের মতোই একবারও এতে আপত্তি করছে না। থেকে থেকে কেবল বান মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফের আবার উগোর গায়ে গা ঘষছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছিল ওরা এমন ব্যবহার করছে যেন আমার উপস্থিতিটা একেবারেই অবান্তর। খালি মনে হচ্ছিল, ক্লেমেন্টিনার সঙ্গে আমিও যদি অমন প্রণয়রঙ্গে মেতে উঠতে পারতুম তো উগোর সমুচিত জবাব দেওয়া হত। কিন্তু তা তো অসম্ভব নয়। প্রথমত, ক্লেমেন্টিনা আমার মনকে টানে নি আর তাছাড়া ও চায়ওনি আমি ওর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করি। ক্লেমেন্টিনা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, মাথাটা পেছন দিকে এলানো, মুখটা খোলা, হাত মুঠো কোলের ওপর রাখা।

অস্তিয়ায় এসে আমরা স্নানের জায়গায় চলে এলাম। একটা কুঠরিতে ঢুকে পর পর সকলেই পোশাক পাল্টে নিলাম। স্নানের পোশাক পরে আমরা চারজন যেই এসে দাঁড়ালাম, আমাদের চেহারার তফাতটা প্রকট হয়ে পড়ল। গ্রেজিয়ার সুন্দর একহারা গড়ন, সুপুষ্ট দীর্ঘ পা, ভরা বুক। অপর দিকে ক্লেমেন্টিনার শরীরের মধ্যভাগে মনে হয় যেন একটা বালিশ বাঁধা, তার পাছা আর বুক শুধু চোখে পড়ে, কোমর আর গলা বলে কিছু নেই। উগো আর আমার তফাতটা তো আরো স্পষ্ট। উগোর শরীরটা কুস্তিগীরের মত। পেটানো পেশল চেহারা, বাদামি রং, চওড়া কাঁধ আর কোমরের দিকটা সরু। স্নানের জাঙিয়াটা পাছার সঙ্গে আটকে আছে যেন। লোমশ উরুদ্বয় ঈষৎ কাঁপছে। আর আমি দেখতে ছোটখাট, সরু সরু পা, শরীরে পেশীর বালাই নেই, চামড়াসর্বস্ব দু'টি হাত—অবিকল একটা মাকড়সার মতন! উগো খপ্ করে গ্রেজিয়ার হাত ধরে তপ্ত বালুরাশির ওপর দিয়ে ছুটে চলল সমুদ্রের দিকে এবং মাথা নীচু করে দুজনেই এক সঙ্গে ঝাঁপ দিল সমুদ্রের বুকে। 'কী সুন্দর মিলেছে

ছুটিতে!' ক্লেমেন্টিনা বলল। এবং বলাই বাহুল্য, বিরক্তির মাত্রা এতে আমার চড়েই গেল। দেখা গেল, ছুটিতে মিলে সমুদ্রের জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছে, একে অন্যকে ঠেলছে, ধাক্কা দিচ্ছে। উগো এবার গ্রেজিয়াকে আড়কোলা করে তুলে নিল। গ্রেজিয়া উগোর গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে লাগল। ক্লেমেন্টিনাকে শুধোলাম ও নাইবে কি না। জবাবে বেশ সানন্দেই সে ঘাড় নাড়ল। কিন্তু সমুদ্রতীরের কাছাকাছি থাকতে চায় ও—কারণ সাঁতার যে জানে না। অগত্যা, দু ফুট গভীর গরম নোংরা জলে নাইতে নামলাম। আশপাশে বাচ্চারা চেল্লাচিল্লি করছে, বল নিয়ে লোফালুফি করছে। নার্স আর মায়েরা ওদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। একটু দূরে রেডিওতে তার স্বরে বাজছে পুরনো একটা গান। উগো আর গ্রেজিয়া এদিকে পাকা সাঁতারুর মত সাঁতার কাটছে অনেক দূরে। ওরা প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎই আমার কেমন মনে হল, উগো আজ জলে ডুবে মারা যাবে। আপনা আপনিই মনে আমার এই চিন্তার উদয় হল। মনে হল এটা ঘটতে বাধ্য, এবং ঘটা উচিত। উগো আমার ওপর অবিচার করেছে। অতএব মরতে ওকে হবেই। চিন্তাটা মনে আসামাত্র আমার মনে শান্তি ফিরে এল। ক্লেমেন্টিনার কাছে আমি এগিয়ে গেলাম—ও তখন দুহাতে মোটা দড়িটাকে ধরে জলে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম: 'বুঝলে, উগোর মত লোকেরা বাহবা দেখাতে যায়। তারপর খিল ধরে একেবারে জলের তলায়। এরপর বেহুঁশ অবস্থায় লোকেরা ধরাধরি করে পাড়ে নিয়ে আসে, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা চালায়।' ক্লেমেন্টিনা আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না আমার কথা। বলল: 'কিন্তু উগো খুব ভাল সাঁতার জানে!' মাথা নেড়ে বলি: 'অস্বীকার করি না, উগো ভাল সাঁতার জানে...কিন্তু মজা হল, ও সেই ধরনেরই লোক যার রোববারের বেড়ানোটা শেষ হয় বালির ওপর শুয়ে ও যার জন্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কথাটা আমার কানে গেছে?'

কিছুক্ষণ পর গ্রেজিয়া আর উগো উঠে এল জল থেকে। তারপর তারা ছুটোছুটি শুরু করল তীর ধরে। এই করে করে গায়ের জল নাকি শুকিয়ে নিচ্ছে ওরা। এই একজনের পেছনে অন্য জন ছুটছে, একজন আরেক জনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরছে। ফের আবার বালির ছোট-ছোট বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ছে। এক সঙ্গে হুটোপাটি করে পড়ে যাচ্ছে বালির ওপর। ক্লেমেন্টিনার

পাশে দাঁড়িয়ে ওদের এসব কাণ্ড কারখানা দেখছিলাম। ক্লেমেন্টিনা তখনো দড়িটা আঁকড়ে ধরে আছে। মন-চক্ষে দেখলাম, উগো ঝাঁপিয়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে, যথারীতি খিল ধরেছে, প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছে, ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। লোকজন ওকে নিয়ে আসছে ডাঙায়, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করছে। উগো মরে যাবে তেমনটা মনে হয়নি ঠিকই, তবে তাকে নিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা যাকে বলে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে ভাবতে খুব খারাপ লাগছিল না। ইতিমধ্যে শ্রীমান-শ্রীমতী শুকোবার পালা সাঙ্গ করে এসে হাজির হল। উগো বলল নৌকোয় চড়ে বেড়াতে গেলে কেমন হয়? ক্লেমেন্টিনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বলল, সে সাঁতার টাতার জানে না, সে যাবে না। সুতরাং আমরা তিনজন নৌকোয় উঠলাম। আমি দাঁড়ে বসলাম, গ্রেজিয়া আর উগো বসল গলুইয়ে পাশাপাশি।

শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে ধীরে ধীরে আমি দাঁড় টানছি। চড়া রোদ চারদিকে। অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছি উগো-গ্রেজিয়ার দিকে। ভাবছি, আমার দু'চোখের বিষ দৃষ্টি দেখে বুঝি লজ্জা পাবে ওরা, নিজেদের সামলে নেবে। কিন্তু কোথায় কি। কিছু সময় আগে ট্রেনে যেমনটি করছিল, এখানেও তেমনি গা ঘষাঘষি ঠাট্টা-তামাসা সমানে চলেছে। ওদের ভাবখানা এমন, আমি যেন ভাড়া করা মাঝি। এবং এটা আরো স্পষ্ট করে তুলতেই যেন উগো ভাঁড়ামোর ভঙ্গিতে বলে উঠল: 'হ্যাখো লক্ষ্মী দাদা আমার বাঁ দিক দিয়ে টানো। তা নয়ত ওই ভেলাটায় গিয়ে ধাক্কা খেতে হবে, বুঝেছো?' এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বললাম: 'আচ্ছা উগো, কেউ কখনো তোমায় বলে নি কি রকম বেয়াদপ অসভ্য তুমি একটা?' সোজা হয়ে বসল উগো। বলল: 'তাঁর মানে?' এমনভাবে বলল, যার মানে দাঁড়ায়: 'শুনছি কি আমি? ঠিক ঠিক সব শুনছি তো?' দাঁড় টানতে টানতেই বললাম: 'ঠিকই বলেছি, মোটা মাথা অসভ্য কোথাকার···কেন, কারু কাছে শোননি না কি কখনো?' উগো গলার স্বর চড়িয়ে বলল: 'বলি হয়েছেটা কি তোমার?' ঠাণ্ডা গলায় বলি: 'কি হয়েছে আমার? আমার কিছুই হয়নি, হয়েছে তোমার। তুমি হচ্ছো পয়লা নম্বরের বদমাস।' 'দ্যাখো, মুখ সামলে কথা কোয়ো।' 'হক কথাই কইছি। তুমি একটা বদমাস, একটা জানোয়ার।' 'হ্যাখো, সাবধান বলছি, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল উগো। আমার

বুকের ওপরটায় কষে এক ঘা লাগাল। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে আমিও তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু পাল্টা মার দেবার আগেই চট করে সে আমার কব্জিটা দুটো আঙুলে সাঁড়াশির মত কষে ধরল। দুজনেই দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করছি। গ্রেজিয়া তখনো বসে। সে চিৎকার করছে আর থামতে বলছে আমাদের। সজোরে একবার নড়ে উঠতেই নীচু, সরু নৌকোটা উল্টে গেল। হুড়মুড় করে সকলেই পড়ে গেলাম জলে।

তীর থেকে বেশি দূরে যাইনি। জলে পড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও আমি মনে মনে বলছিলাম: 'আর কি, এবার ব্যাটার খিল ধরবে, ডুববে হতভাগা ···আলেসান্দ্রো আর গিউলিওর দশা হবে ওর, এবার নির্ঘাত মরবে।' নৌকোটা ভাসতে ভাসতে সরে যাচ্ছিল দূরে, জলে ভাসছিল দাঁড়, আমরা তিনজন সাঁতার কাটছি। 'বোকা পাঁঠা।' চিৎকার করে উগো গালাগালটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। গ্রেজিয়া নির্বিকার ভাবে সাঁতারে এগোচ্ছিল তীরের দিকে। 'আর তুমি আস্ত ছাগল একটা,' বললাম আমি। কথাটা বলতে গিয়ে এক ঢোঁক জল গিলে ফেললাম। এবার উগো আর আমার কথা গায়ে না মেখে গ্রেজিয়ার দিকে সাঁতরে এগিয়ে চলল। আমিও তীরের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। সারাক্ষণ মাথায় ঘুরছে কখন খিল ধরে উগোর। কখন তলিয়ে যায় ব্যাটা জলে। হঠাৎ টের পেলাম আমার ডান দিকটায় তীব্র ব্যথা—ডান দিকের কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। বুঝলাম খিল আমাকেই ধরছে, উগোকে নয়। এক লহমায় ঘটনাটা ঘটল আর আমিও মুহূর্তেই বেসামাল হয়ে গেলাম। ব্যাথাটা ছাড়ছে না। পাগলের মত হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আবার এক ঢোঁক জল গিলে ফেললাম। 'বাঁচাও,' চিৎকার করতে গিয়ে আবার এক ঢোঁক জল। খিল ধরা অবস্থায় ভাসছি আর ডুবছি। 'বাঁচাও' বলে আবার চেঁচিয়ে উঠে ডুবে গেলাম। জল পেটে যাচ্ছে অনবরত। ডুবেই যেতাম, যদি না একটা হাত আমায় ধরে ফেলত। এবং একটা গলা, উগোর গলা, বলে উঠল: 'চুপ-চাপ থাকো, আমি তোমায় তীরে তুলে দিচ্ছি।' চোখ বুঁজে রইলাম। এবং সম্ভবত বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

হুঁশ ফিরে এলে কতক্ষণ পরে জানি না—পিঠের তলায় তীরভূমির তপ্ত বালি টের গেলাম। কে যেন আমার কব্জি ধরে আছে, এবং হাত ওঠাচ্ছে, নামাচ্ছে।

কে আরেকজন পাশে উবু হয়ে আমার বুক আর পেট মাসাজ করে দিচ্ছে। প্রচুর ধুলোয় ভরা বাতাস, চোখ ধাঁধানো রোদ্দুর, আর আমার চার ধারে রোমশ পায়ের অরণ্য। এবং সেই পায়ের মালিকেরা মুমূর্ষু আমায় দেখছে। কানে এল কে যেন বলল: 'মনে হচ্ছে, বারোটা বেজে গেছে।' আরেকজন মন্তব্য করল: 'বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই এরা মরে।' জল গিলে গিলে আমার তখন পেট ফুলে ঢোল, মাথাটা অসম্ভব ভার-ভার, হাত দুটো হাপরের মত ক্রমাগত উঠছে নামছে। হঠাৎ আমার প্রচণ্ড রাগ হল। হাত ছাড়িয়ে নিতে বলে উঠি: 'ছেড়ে দাও আমাকে · যত্তো সব।' বলেই ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সেই অলক্ষুণে দিনটার কথা আর বাড়াতে চাই না। এক হপ্তা বাদে দোকানে, উগো যখন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে, গ্রেজিয়া আমায় নীচু গলায় বলল: 'গত রোববার আরেকটু হলে তুমি ডুবে যাচ্ছিলে কেন জানো?' 'না কেন?' 'উগো বলেছে আমায় · একটা অলৌকিক শক্তি নাকি রক্ষা করে ওকে—ওর বিরুদ্ধে কেউ গেলে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে···ও বলে, ওর নাকি অদৃশ্য রক্ষা কবচ আছে,···আচ্ছা, রক্ষা কবচ ব্যাপারটা কি বলো ত?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলি: 'রক্ষা কবচ মানে হল, কোনো জিনিস বা কোনো মানুষ পবিত্র হলে ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করেন।'

গ্রেজিয়া কিছু বলার আগেই উগো এসে হাজির হল। হাতে ওর সুতী কাপড়ের একটি থান। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে থানটা খুলতে খুলতে বলল: 'এ ধরনের জিনিসই আপনার চাই, সিনোরা।' গ্রেজিয়ার তাকাবার ধরণ দেখে বুঝতে বাকি রইল না, উগোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। সত্যিই অবাক কাণ্ড। উগো সুপুরুষ ও শক্তিশালী যুবক··· শুধু তাই নয়, অলৌকিক রক্ষা কবচে সুরক্ষিতও বটে।

□ বন্ধুত্ব □

মারিয়ারোজা নামটার মধ্যে দুটো নাম আছে। এবং এই নাম যার তারও দুটো রূপ—চেহারা এবং নৈতিক চরিত্র দু'দিক দিয়েই। গোল চাঁদের মতই বিরাট একখানা মুখ যা শরীরের সঙ্গে একেবারে বেমানান। এক নজর তাকালেই মনে হবে, ওই মুখ দিয়ে দুটো মুখ স্বচ্ছন্দে বানানো যায়। তাছাড়া ওই মুখখানা সব সময়ই শান্ত, স্মিত স্বর্গীয়। আসলে কিন্তু ওর চরিত্রটা ঠিক উল্টো। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি, মারিয়ারোজা একেবারে জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। এজন্যেই বলেছি, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়েও ওর স্বভাবটা দু'মুখো।

কত ভাবে যে ওকে প্রেম নিবেদন করেছি বলার নয়। প্রথম প্রথম সম্ভ্রমের সঙ্গে সূক্ষ্ম উপায়ে করে দেখলাম সুবিধে হচ্ছে না। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে এলাম। সিঁড়ি পথে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থাকি। জোর করে চুমু খেতে চেষ্টা করি। বিনিময়ে পাই কয়েকটা সজোর ধাক্কা, এবং শেষটায় গালে চপেটাঘাত। তখন ঠিক করলাম, অবজ্ঞার ভাব দেখাবো, ওকে শেষ করে ফেলব এমন ভাব দেখাবো। এবং দেখা হলেই মুখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হল। আমার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল ওর কাছে। কি আর করি। ওকে মিনতি করি, সজল চোখে আকুল আবেদন জানাই আমায় ভালবাসতে—কোনো সাড়া নেই। মেয়েটা যদি বরাবরের মত আমাকে বরবাদ করে দিত তো ল্যাঠাই চুকে যেত। কিন্তু না—যখনি মন থেকে ওকে চিরতরে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি তখনি কোনো না কোনো কথায়, ভাবে ভঙ্গিতে ও আবার আশা জাগিয়ে তুলছে আমার মনে। পরে জেনেছি, অনুরাগী ভক্তের দল মেয়েদের কাছে অলংকারের মত। পারতপক্ষে তারা তা হাতছাড়া করতে চায় না। সুতরাং, ওর ওই ভাব ভঙ্গি দেখে ভাবতাম, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে···আবার চেষ্টা করে দেখা যাক।' হঠাৎ একদিন শুনি, ছেনাল মেয়েছেলেটা আমারই প্রাণের বন্ধু আত্তিলিয়োকে বিয়ে করছে। এতে ভয়ানক চটে গেলাম আমি। অনেকগুলো কারণও ছিল তার। প্রথমত, আমারি বঁধুয়া বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া গোছের হল ব্যাপারটা। আর দ্বিতীয়ত,

আমিই আভিলিয়েকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম মারিয়ারোজার সঙ্গে। তার মানে অজান্তে আমিই খাল কেটে কুমীর নিয়ে এসেছি।

তবে বন্ধু হিসেবে আমি বিশ্বস্ত, এবং বন্ধুত্ব আমার কাছে সবার ওপরে। মারিয়ারোজার প্রেমে পড়েছিলাম ঠিক কথাই, কিন্তু আভিলিয়োর সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হবার পর থেকেই মারিয়ারোজা আমার কাছে পবিত্র হয়ে উঠল। মেয়েটার কিন্তু আমার সঙ্গে আগেকার ছলাকলা চালিয়ে যাবারই মতলব ছিল, কিন্তু আমি সম্পর্কটা সম্ভবত খোলাসা করে দিলাম। এবং শেষটায় একদিন খোলাখুলি ওকে বললাম: 'ছাখো, তুমি মেয়ে, আর মেয়েরা বন্ধুত্বের মহিমা বোঝে না —আভিলিয়োর সাথে যখন থেকে তুমি মিশেছো, তখন থেকেই তুমি আমার কাছে হারিয়ে গেছো, তোমাকে দেখতে পাইনা এখন আর, কোনো কথাও কানে ঢোকে না··· ব্যাপারটা বুঝলে তো?'

তখনকার মত আমার কথা সে মেনে নিল বলেই মনে হল। কিন্তু এরপরও যখন দেখলাম আমার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলছে ও, ঠিক করলাম ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দেব। এবং সেটা বজায়ও রেখেছিলাম। পরে শুনতে পেলাম, ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। মারিয়ারোজার রোমের বাড়িতে ওরা আছে। আভিলিয়ো দশ দিনের মধ্যে নয় দিনই বেকার বসে থাকে। সে একটা ছোটখাট কাজ জুটিয়ে নিয়েছে শুনলাম। এসব শুনে মনটা একটু ঠাণ্ডা হল। কারণ বোঝা গেল, ওদের অবস্থাটা খুব সচ্ছল নয়। সুতরাং বিয়েটাও যে খুব সুবিধের চলবে এমন মনে হল না। তবে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রাখলাম। হাজার হলেও বন্ধু বন্ধুই, এবং বন্ধুত্ব পবিত্র জিনিস।

আমি নলের মিস্ত্রি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে নল সারাই করা আমার কাজ। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কখনো কখনো অবাঞ্ছিত জায়গায় গিয়েও পড়তে হয় আমাদের। একদিন একজনের বাড়ি যাচ্ছি সারাইয়ের ব্যাপারে। কাঁধে আমার যন্ত্রপাতির বাক্স, হাতে জড়ানো সীসের নল। ভিয়া রিপেত্তা ধরে যেতে যেতে শুনি কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠল: 'এরনেস্টো' ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, স্বয়ং শ্রীমতী মারিয়ারোজা দাঁড়িয়ে। ওর ওই বড়সড় ভরাট মুখ, যাতে প্রশান্তি আর ধূর্তোমো মিশে আছে, আর ছোটখাট শরীরে সরু কোমর এবং সুডৌল বুক ও পাছা দেখে আমার মনে ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি ফিরে এলো।

প্রায় নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এলো। তবুও মনে মনে নিজেকে বোঝালাম: 'তুমি বন্ধু⋯বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতে হবে।' শুকনো গলায় মারিয়ারোজাকে বলি: 'আবার দেখা হল তাহলে।'

মারিয়ারোজার হাতে বাজারের ব্যাগ। তাতে আনাজপাতি আর হলদে কাগজে মোড়া নানান প্যাকেট ঠাসা। মৃদু হেসে সে বললে আমায় চিনতে পারছোনা না কি?'

'কেন পারবো না? বললুম তো, আবার দেখা হল তাহলে?'

মারিয়ারোজা বললে: 'আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে একটু আসবে? দ্যাখো না, সকালবেলায় উঠে দেখি রান্নাঘরের ময়লা জলের নলটা দিয়ে জল যাচ্ছে না⋯ একটু এসো না আমার সঙ্গে।'

বললাম: 'বেশ তো, মেরামতি ব্যাপার যদি হয় তাহলে⋯' মারিয়ারোজা এমন ভঙ্গিতে তাকাল আমার দিকে যা দেখে আগে হলে আমার মাথা ঘুরে যেত বলল: 'বাজারের ব্যাগটা কিন্তু তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে।' অতএব শ্রীমতীর পেছন পেছন আমি চললাম গাধার মত বোঝা বইতে বইতে। একদিকে আমার যন্ত্রপাতির বাক্স ও সীসের নল আর ওদিকে ওর বাজারের ব্যাগ।

বেশিদূর যেতে হল না। ভিয়া রিপেত্তার আড়াআড়ি একটা রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। ছোট একটা দরজা দিয়ে একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম। মনে হল, একটা গুহায় ঢুকলাম যেন। জঘন্য একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম— স্যাঁতসেঁতে তেমনি অন্ধকার আর দুর্গন্ধময়। অর্ধেকটা উঠেছি এমন সময় আমার দিকে ফিরে একটু হেসে সে বললে: 'মনে আছে, অন্ধকার সিঁড়িতে তুমি কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে? ভীষণ ভয় পাইয়ে দিতে আমাকে। না কি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেছো?' আড়ষ্টভাবে জবাব দিই: 'আমার কিছুই মনে পড়ছে না, মারিয়ারোজা⋯এটুকু বলতে পারি, আমি আস্তিলিয়োর বন্ধু আর বন্ধুত্বের স্থান সবার ওপরে।' থতমত খেয়ে সে বললে: 'তুমি ওর বন্ধু, এতে আর কথা কী?'

মারিয়ারোজার ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। ছোট ছোট তিনখানা ঘর। ঘরের জানালা দিয়ে নীচের চাতালটা দেখায় কুয়োর মত, এত আলোহীন অন্ধকার চাতালটা। রান্নাঘরটায় নড়াচড়ার জায়গা নেই। কাঁচের দরজাটা

খুললেই একটা ঝুল বারান্দা। পায়খানা এদিকটাতেই। পা দুটো দুদিকে দিয়ে একটা চেয়ারে বসল মারিয়ারোজা। কোঁচড় ভর্তি বীন নিয়ে সে ছাড়াতে লাগল। আর আমি মেঝের ওপর যন্ত্রপাতির বাক্সটা রেখে হাঁটু গেড়ে বসলাম। ময়লা জলের নল মেরামতির কাজে হাত লাগালাম। এক নজর তাকিয়েই বুঝলাম নলটার বারোটা বেজে গেছে। নতুন নল লাগানো ছাড়া উপায় নেই বললাম: 'ত্যাখো, নতুন নল লাগাতে হবে · খরচা দিতে পারবে তো?'

'সে কি বন্ধুত্বের কথা এর মধ্যেই ভুলে গেলে?'

'না, না, ভুলবো কেন?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, 'ঠিক আছে, নিখরচায়ই করে দোব···তবে এর বদলে একটা চুমু আমায় দিতে হবে।'

'বন্ধুত্বের কি হবে তাহলে?'

ঠোঁট কামড়ে ভাবি—কি বন্ধুত্ব রে বাবা, শাঁকের করাত একেবারে। মুখ ফুটে অবিশ্যি বলি না কিছুই। সাঁড়াশি দিয়ে ফিটিং খুলে ফেললাম। ওগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। নলটা সরিয়ে ফেলি, ঝালাইয়ের ল্যাম্পটা ব্যাগ থেকে বার করে তাতে কিছুটা পেট্রোল ঢেলে নিই। নীরবে কাজ করে যাচ্ছি। এমন সময় সে বলছে: 'আচ্ছা সত্যই কি তুমি আত্তিলিয়োর বন্ধু?'

ঘরে তাকাই মারিয়ারোজার দিকে। দেখি চোখ নামিয়ে সে বসে বসে বীনের খোসা ছাড়াচ্ছে। মিষ্টি মৃদু হাসি ওর মুখে। বলি: 'বন্ধু বৈকি।'

শান্তভাবে সে বললে: 'বেশ তবে তো তোমার কাছে মন খুলেই কথা বলতে পারি···ওকে যখন ঘনিষ্ট ভাবে চেনো তখন তোমাকে বলি, ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা সত্যি না মিথ্যে সেটা আমায় বলতে হবে।'

ওকে ওর ধারণাগুলো বলতে বললাম। ইতিমধ্যে ল্যাম্পটা জ্বেলে শিখাটা ঠিক করে নিচ্ছিলাম। ও ফের বলে চলল: 'এই ধরো, যে কাজটা সে এখন করছে সেটা ঠিক তার উপযুক্ত হয়নি, এটা তোমার মনে হয় না? মাল বয়ে বেড়ানোর কাজ ···'

'অর্থাৎ কুলির কাজ···'

'মাল বওয়ার কাজ একটা পেশাই নয়···আমি চেষ্টা করছি, ও যাতে পুরুষ

নার্সের ট্রেনিংটা নিয়ে নেয় সেজন্যে···আমার বোন পলি ক্লিনিকে ঢুকতে ওকে সাহায্য করতে পারে··'

এর মাঝে আমি নলটা বসিয়ে দিয়েছি। ঝালাইয়ের ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে প্রায় না ভেবেচিন্তেই শুধোলাম: 'তুমি সত্যি কথাটা জানতে চাও, না কি ভদ্রগোছের একটা জবাব চাও?'

'সত্যি কথাই শুনতে চাই।'

'গ্যাখো, আত্তিলিয়োর বন্ধু আমি ঠিক কথাই, কিন্তু তাই বলে তার দোষত্রুটিগুলো আমার মোটেই নজর এড়ায় না · প্রথমত, সে বড্ডো আলসে।'

'আলসে?'

এক টুকরো টিনের পাত নিয়ে ল্যাম্পের সামনে ধরলাম। এবং ঝালাইয়ের কাজ শুরু করে দিলাম। আগুনের শিখার গর্জনে কথা শোনা যাবে না বলে গলা চড়ালাম। বললাম: 'হ্যাঁ, আলসে। গ্যাখো মেয়ে, আলসে স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাবার জন্য তোমাকে তৈরি থাকতে হবে আমি খাটিয়ে লোক, তোমার স্বামী তা নয়। দেরীতে ঘুম থেকে ওঠা তার স্বভাব। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে-টুরে কাফেতে গিয়ে কাগজ-টাগজ পড়ে, খেলার খবর নিয়ে আলোচনা করে··কুলির কাজের পক্ষে অবিশ্যি এতেই চলে, কিন্তু পুরুষ নার্সের কাজে দায়িত্ব আছে না, পুরুষ নার্স হিসেবে ওকে ভাবতেই পারছি না।'

একই রকম শান্ত চিন্তামগ্ন স্বরে মারিয়ারোজা বলে চলল: 'তার চেয়েও বড় কথা কি জানো, আসলে কাজটা ও আদৌ করছে কিনা সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে···কাজে যাওয়ার কথা ও বলে বটে—কিন্তু টাকা পয়সার নামগন্ধও তো এখন অব্দি পেলাম না···আমার এখন তো মনে হচ্ছে, ও আমায় মিছে কথা বলেছে···তোমার কি মনে হয়?'

আবারো না ভেবেচিন্তেই বলে ফেললাম: 'মিছে কথা? তা ওর মতো এত বড় মিথ্যেবাদী তো এখন অব্দি আমার চোখে পড়ল না···হয় কে নয়, নয়কে হয় করতে ওর কতক্ষণ···মিছে কথা বলা ওর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।'

'আমারো তাই মনে হচ্ছিল···তা কাজে যখন সে যায় না, তখন কি করে?

স্রেফ কিছুই না করে ঘোরাঘুরি করে কাফেতে গিয়ে বসে, এমন তো আমার মনে হয় না···কিছু একটা ব্যাপার আছে···এত ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে বেরিয়ে যায়, সবসময়ই এত অন্যমনস্ক।' এই বলে খোসা-ছাড়ানো বীনগুলো রাখার জন্যে তাক থেকে একটা সস্‌প্যান সে টেনে নিল। ঘাড় ফিরিয়ে মারিয়ারোজাকে একটু দেখে নিলাম-হাসি-হাসি শান্ত মুখখানা। একটুক্ষণ পরে সে বলল: 'আমার কি মনে হয় জানো? এর মধ্যে কোনো মেয়ে আছে নিশ্চয়···তুমি তো ওকে জানো, আচ্ছা, আমার এ ধারণাটা সত্যি কিনা বলতে পারো?'

নিজেরই ভেতর থেকে একটা সতর্ক বাণী শুনতে পেলাম: 'ধীরে রজনী ধীরে··ফাঁদে পা দিয়ো না··' মনের তিক্ততা বিচক্ষণ তা ছাপিয়ে উঠেছিল বলে, নাকি ওর মুখে অমন স্বামী নিন্দা শুনে জানি না, আমার মনের আশা আবার জেগে উঠল, এবং না বলে পারলাম না: 'তোমার ধারণা সত্যি বলেই আমার মনে হয়··মেয়ে হলে ওর আর মাথার ঠিক থাকে না—সুন্দরী-কুৎসিত বা ছুঁড়ি-বুড়ির বালাই নেই··কেন, তুমি কি তা জানতে না?'

ঝালাইয়ের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ল্যাম্পটা নিভিয়ে নরম ধাতুটুকু আঙুল দিয়ে সমান করে ফেললাম। এরপর কষে এঁটে দিলাম। এর মধ্যেই সে আবার বলে চলেছে বেশ শান্তভাবে: 'হ্যাঁ, তা জানতুম বটে, তবে সঠিক কিছু না এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানো, খুব সম্ভব এমিলিয়ার সঙ্গে ওর মেলামেশা চলছে—চেনো তো এমিলিয়াকে? সেই যে লাল চুলওলা মেয়েটা—লণ্ড্রিতে আমার সঙ্গে কাজ করত··তোমার কি মনে হয়?'

উঠে দাঁড়ালাম। মারিয়ারোজাও উঠে দাঁড়াল। ছড়ানো বীনগুলো সে সস্‌প্যানে রেখে জামা ঝেড়ে খোলাগুলো ফেলে দিল। কল খুলে সস্‌প্যানে খানিকটা জল ঢেলে নিল। আমি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর ওই অদ্ভুত সুন্দর সরু কোমরে আমার দুটো হাত রেখে বললাম: 'ধরেছো তুমি ঠিকই, রোজই সে এমিলিয়ার সঙ্গে সন্ধে নাগাদ দেখাসাক্ষাৎ করে—লণ্ড্রির বাইরে অপেক্ষা করে, তারপর এমিলিয়াকে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। সবি তো শুনলে—তা কী আশা করেছিলে?'

মৃদু হেসে মাথাটা একটু ঘোরালে সে, এবং বললে: 'এরনেস্তো, তুমি ওর বন্ধু বললে না? আমায় একা থাকতে দাও।'

জবাবে ওকে বাহু বন্ধনে পাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার হাত ছাড়িয়ে মারিয়ারোজা কঠিন স্বরে বললে: 'তোমার মেরামতির কাজ তো হয়ে গেছে, এবার তুমি চলে যাও বরং।' ঠোঁট কামড়ে উত্তর দিলাম: 'বলেছো ঠিকই··· তবে তোমায় দেখলে মাথা যে আমার ঘুরে যায়, কি করি বলো···যাক্, এখন থেকে সব সময় মনে রাখব আমি আত্তিলিয়োর বন্ধু আর তুমি আত্তিলিয়োর বউ।' কথাটা বলছিলাম বটে কিন্তু মনটা টন টন করছিল। যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে মারিয়ারোজাকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় রান্নাঘরের দোরটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল আত্তিলিয়ো।

আমাকে দেখে খুশী হল আত্তিলিয়ো। সৌহার্দ্যের সুরে বলল: 'তারপর এরনেস্তো, কি খবর?' বললাম: 'মারিয়ারোজা নলটা সারাতে বলল, সারিয়ে দিলাম। নতুন একটা নলই বসিয়ে দিয়েছি।' আমার কাছে এগিয়ে এসে আত্তিলিয়ো বলল: 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ···' ঠিক সেই মুহূর্তে মারিয়ারোজার শান্ত অথচ অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে দুজনেই ঘুরে তাকালাম: 'আত্তিলিয়ো···'

রান্নাঘরের উনুনের সামনে মারিয়ারোজা মৃদু হাসি, উনুনের উপরে একটা হাত। গলা না চড়িয়ে একনিঃশ্বাসে সে বলে চলল: 'আত্তিলিয়ো, এরনেস্তো বলছিল তুমি নাকি আলসে, কাজটাজ করতে চাও না···'

'বলেছো এ কথা?'

'তাছাড়া, আর যা-যা শুনেছি তাও সত্যি বলে স্বীকার করেছে এরনেস্তো। এমিলিয়ার সঙ্গে রোজ দেখা করো তুমি এবং ওর সঙ্গে মেলামেশা করছো··· আমি তো দাসী বাঁদী ছাড়া কিছু নই, এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ইস্ত্রির কাজ করে মরছি আমি, আর তুমি এলিমিয়ার সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছো— এদিকে আমায় বলছো কিনা কাজে যাও তুমি···এখন এসব অস্বীকার করে লাভ নেই, তোমার বন্ধু এরনেস্তো তোমাকে চেনে জানে, সমস্ত কথাই সে সত্যি বলে জানিয়েছে···' সম্পূর্ণ শান্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছিল মারিয়ারোজা। এবং এই প্রথম অনুভব করলাম, এক উন্মাদ রমণীর কাছে আমি মন খুলে কথা বলেছি। ওর কথা শেষ হতে না হতেই (মারিয়ারোজার কথা বলার সময় আত্তিলিয়ো মুখ খিঁচিয়ে 'একথা বলেছো তুমি', 'একথা বলেছো তুমি' বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে) উনুনের ওপর থেকে মারিয়ারোজা বেশ ভারী একটা

ইস্ত্রি ছুঁড়ে মারল আন্তিলিয়োর মাথা লক্ষ্য করে। এত অব্যর্থ লক্ষ্যে ইস্ত্রিটা ছুঁড়েছিল মারিয়ারোজা যে মাথাটা নীচু না করলে নির্ঘাত মারা যেত আন্তিলিয়ো। এর পরের ঘটনা অবর্ণনীয়। পাগলের মত একটার পর একটা ভারী ভারী মারাত্মক জিনিস তুলে নিয়ে মারিয়ারোজা ছুঁড়ে মারতে লাগল, এবং দু তিনবার নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে দরজা দিয়ে দৌড়ে পালাল আন্তিলিয়ো। পালালাম আমিও। ফেলে এলাম দুতিন গজ নল। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এলাম। আন্তিলিয়ো চিৎকার করে আমায় বলছিল: 'এদিক আর কখনো মাড়াবে না তুমি · ফের যদি তোমায় দেখেছি তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। ব্রিজ পেরিয়ে পিয়াজ্জা দেল্লা লিবার্তার বাগানে এসে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। বসে বসে ভেবে দেখলাম বন্ধুত্বের খাতিরেই অত কথা বলেছি---কারণ আমি জানতাম আন্তিলিয়োর স্বভাব ওই রকমই। এবং মনে মনে সেজন্যে বিরক্ত হতাম কিন্তু সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনদিন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো না।

□ বুড়ো হাবড়া □

মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোর অভ্যেস যদি আপনার থাকে, তাহলে দেখবেন কখন যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেছে টেরই পাবেন না। কখন মেয়েরা যে আপনাকে বাবা বা ঠাকুরদার আসনে বসিয়েছে বুঝতেই পারবেন না। মাঝ বয়েসীদের ক্ষেত্রেই সমস্যাটা বেশী। কারণ তাদের মাথার ভেতরে আরো একটা মাথা থাকে। বাইরেব মাথার চুল পাকা, কপালে বলিরেখা, দাঁত ক্ষয়াটে, চোখ দ্যুতিহীন। আর ভেতরের মাথা কিন্তু থেকে যায় অবিকল তরুণ বয়েসীর মতই। সে মাথায় ঘন কালো চুল, মসৃণ মুখ, উজ্জ্বল চোখ। এই ভেতরের মাথাটাই সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় মেয়েদের দিকে। ভাবে এই বুঝি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে সে। কিন্তু মেয়েদের চোখ গিয়ে পড়ে বাইরের মাথাটায়, এবং তারা ভাবে : 'বুড়োটা চাইছেটা কি ? ওযে আমাদের ঠাকুরদার বয়েসী, সেটা খেয়াল নেই ওর ?'

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে যে সেলুনে নাপিতের কাজ করে আসছি, সে বছর সেই সেলুনটা বাড়ানো হয়েছিল। আয়না এবং মেসিন-টেসিনগুলো পাল্টানো হয়েছে, দেয়ালে ও দেয়াল-আলমারিতে নতুন রং লাগানো হয়েছে এবং সর্বোপরি কাজে বহাল করা হয়েছে একটি ম্যানিকিউরিস্টকে। মেয়েটির নাম আইওলে। মালিক ছাড়া দোকানে আমরা তিনজন। আমাতো নামে বছর পচিশেক বয়েসের এক ছোকরা। আগে পুলিশে কাজ করত। বেশ গম্ভীর-সম্ভীর মেজাজের। গিউসেপ্পি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। তাছাড়া সে বেটে, মোটা ও টেকো। বাকি রইলাম আমি। পুরুষ মানুষের মাঝখানে একটি মেয়ে কাজ করতে এলে যা হয়। আমরা তিনজনই (ব্যাপারটা শিগগিরই আমার নজরে পড়ল) ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলাম আইওলের দিকে। মেয়েটা দেখতে ছবি-ছবি গোছের। সুশ্রী, সুবেশা, নাক মুখ চোখ সুন্দর এবং মাথায় কালো কুচকুচে চুল। এরকম মেয়ে লাখো লাখো আছে। এখানে বলে রাখা ভালো, যদিও গর্ব করছিনে, দেখতে আমি সুপুরুষ। ছিপছিপে চেহারা আমার, লম্বায় প্রমাণ সাইজ, জবরদস্ত মুখ, এবং মেয়েরা বলে, আমার হাব-ভাব সুন্দর। তাছাড়া আমার

চোখ দুটি নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো—বিশেষত আড়চোখে যখন তাকাই। আমার চোখের দৃষ্টি কোমল ও ভাবময়। তবে কিছুটা সন্দিগ্ধ ভাব হয়ত তাতে আছে। অবিশ্যি আমার সেরা জিনিস হল আমার চুল। হাল্কা বাদামী-রঙা এক মাথা পাতলা কোঁকড়া চুল। আমার গোঁফ জোড়াও দেখবার মত। তাছাড়া, সবসময়ই আমি ফিটফাট থাকি। দোকানের বাইরে নিখুঁত সাজসজ্জা করে বেরুই। গলার টাই, পায়ের মোজা আর পকেটের রুমাল সব ম্যাচ করে নিই। আর দোকানে যে লম্বা অ্যাপ্রনটা আমার পরা থাকে, তার রং এত ধব ধবে শাদা যে সেলুনের নাপিতের নয়, হাসপাতালের সার্জনের গায়ে থাকলেই যেন সেটা মানায় ভালো। এসবের দরুণ মেয়ে মহলে আমি যে জনপ্রিয় হব, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর এই জনপ্রিয়তায় আমি এক রকম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তাই কোনো মেয়েকে মনে ধরলে এমন একাগ্র এবং অর্থপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকাতুম যে তাতেই প্রশংসার কথা ঝরে ঝরে পড়ত। ফলে, একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকাবার পর সেই মেয়ের কাছে যখন এগিয়ে গেছি, দেখেছি ফল টুসটুস করছে, হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই হয়।

দোকানে আইওলের ব্যাপারে আমাতোকে নিয়েই ছিল আমার ভয়। কারণ, সুদর্শন বা আকর্ষণীয় না হলেও সে ছিল ছোকরা বয়েসী। গিউসেপ্পিকে অবিশ্যি আমার কোনো ভয়ই ছিল না কেননা, আগেই বলেছি, বয়েস ওর আমার চেয়ে বেশী আর একেবারেই হতকুচ্ছিত চেহারা। আইওলে তার কোণের টেবিলটায় ঠায় বসে থাকত। বসে বসে ওই একঘেয়েমিতে তার আর বাক্যস্ফূর্তি হত না। দোকানে যে দু'চারখানা খবরের কাগজ থাকত তাই সে বার বার পড়ত। কিংবা খদ্দেরের অভাবে নিজের নখই বসে বসে পালিশ করত। নিজের অজান্তেই কখন চোখ চলে যেত ওর দিকে! খদ্দের এসে চেয়ারে বসলে তোয়ালে তুলে নিয়ে মনোহর ভঙ্গিমায় সেটা খুলে ফেলতাম এবং চুরি করে তাকাতাম আইওলের দিকে। কিংবা কারো সাবানমাখা মাথা হয়ত দুহাতে ঘষে ঘষে ধুচ্ছি, একবার তাকাবোই মেয়েটার দিকে। আবার কখনো হয়ত কারো চুলের ডগা ছেঁটে দিচ্ছি, কুচ কুচ করে বার চারেক কাঁচি চালিয়েই একবার তাকানো চাই। কিংবা আইওলে হয়ত ওর অলস মন্থর ভঙ্গিতে আলমারি থেকে কোনো সরঞ্জাম নিতে উঠল, আয়নার কাঁচে আমার চোখদুটো ওকে অনুসরণ করবেই। আইওলে কিন্তু আদৌ উচ্ছল বা লাজুক

স্বভাবের ছিল না। বরং কেমন জবুথবু ভাবই ছিল তার। ওকে দেখে মনে হত, বেশ বড় একটা ঘুমকাতুরে বেড়াল। ধীরে ধীরে, কিছু কাল কেটে যাবার পর সে টের পেল আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকানোর ব্যাপারটাকে সে মেনে নিল। এবং শেষটায় সেও তাকাতে লাগল আমার দিকে। আইওলের তাকানোয় কোনরকম ঔদ্ধত্যের ভাব ছিল না, কেমন ভারী ভারী আড়ষ্টভাবে তাকাতো। তবে তাকাতো যে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

তাই ভাবলাম ফল এবার পেকেছে। অস্তিয়ায় রোববার বিকেলে সমুদ্র স্নানের নিমন্ত্রণ জানালাম আইওলেকে এক শনিবার। নিমন্ত্রণ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করল সে। তবে জানাল যে তার স্নানের পোশাকটা কিন্তু সুবিধের নয়। একটাই পোশাক তার আছে, আর মুটিয়ে যাওয়ায় সেটা কিছুটা আঁটসাঁট হয়ে গেছে। কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ না করেই বললে: 'দোকানে সারাক্ষণ বসে থেকে একটু মুটিয়ে গেছি।' বুঝলাম মেয়েটা ছল চাতুরীর ধার ধারে না। সোজা সরল কথাটা শুনে ভালই লাগল। পরদিন সান পাওলো ষ্টেশনে আমরা মিলিত হব ঠিক হল। রওনা হওয়ার আগে প্রসাধন পর্ব সযত্নে সারলাম। দাড়ি কামিয়ে খানিকটা ট্যালকম পাওডার বুলিয়ে নিলাম গালে। সরু চিরুণী চালিয়ে চুল ঠিক করে নিলাম—খুসকির চিহ্নমাত্র যাতে না থাকে। একটু ভায়োলেট এসেন্স মাথায় আর রুমালে ছড়িয়ে নিলাম। পরলাম ওপন-কলারওলা শার্ট, হালকা রঙের ট্রপিক্যাল জ্যাকেট ও শাদা প্যাণ্ট। আইওলে কাঁটায় কাঁটায় এসে হাজির হল। বেলা দুটোর সময় নজরে পড়ল ভ্রমণার্থীদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে আইওলে পরনে শাদা পোশাক। কিছুটা খাটো আর মোটা দেখালেও রীতি মত আকর্ষণীয় তরুণী লাগছিল তাকে। কাছে এসে একটু হেসে বলল: 'উঃ, কী ভীড়! মনে হয় সারাটা রাস্তাই দাঁড়িয়ে যেতে হবে আমাদের।' একথায় আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বললাম যে করেই হোক ওর জন্যে একটা সীটের ব্যবস্থা করবোই। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে বললাম—ইতিমধ্যে ষ্টেশনে ট্রেন এসে গেছে। প্ল্যাটফর্মে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। যেন ঘোড়সওয়ার সৈন্য সকলকে তাড়া করেছে। আর সকলেই চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, একে অন্যকে ডাকাডাকি করছে। আমি সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা দরজা ধরে ফেললাম। সবাইকে ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাব, এমন সময় অল্প বয়েসী এক ছোকরা ধাক্কা মেরে আমাকে পাশ

কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আমিও পাল্টা এক ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। ছোকরা আমার জামার হাতা ধরে টান লাগাল। আমিও ছোকরার পেটে কনুইয়ের গুঁতো লাগিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। নিয়েই গোত্তা মেরে ঢুকে পড়লাম এক কামড়ায়। কিন্তু গাড়ল ছোকড়ার পাল্লায় পড়ে সময় নষ্ট করে ফেলেছি। কামরা লোক ভরতি হয়ে গেছে। শুধু একটা সীট খালি ছিল। সেদিকে ছুটে গেলাম, ছুটে গেল সেই ছোকরাও প্রায় এক সঙ্গেই জায়গাটা ধরতে আমি ছুঁড়ে রাখলাম স্নানের পোশাক, আর ছোকরা রাখল তার জ্যাকেট। এবার দুজনে মুখোমুখি। বললাম: 'আমি আগে এসেছি।' 'কে বললে?' 'আমি এসেছি, বলতে বলতে ওর জ্যাকেটটা তুলে ছুঁড়ে মারি ওর মুখের ওপর। ঠিক এই সময়েই এসে হাজির হল আইওলে এবং কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বসে পড়ল। 'ধন্যবাদ, লুইজি।' বললে সে। ছোকরা তার জ্যাকেটটা কুড়িয়ে নিলে। একটু ইতস্তত করে যখন দেখল আইওলেকে হটিয়ে দিয়ে বসা সম্ভব নয়, তখন চলে যেতে যেতে বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলে গেল: 'আহাম্মক বুড়ো হাবড়া কোথাকার।'

ঠিক তখুনি ট্রেনটা চলতে শুরু করল। আইওলের কাছ ঘেঁষে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু তখন সমস্ত উৎসাহ নিবে গেছে আমার। মনে হল, পারলে এক্ষুনি পালাই—গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি চলে যাই। ওই আহাম্মক বুড়ো হাবড়া কথাটা এমন সময় শুনতে হল যখন অমন একটা কথা শোনার জন্য মনের দিক দিয়ে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবে দেখলাম, ছোকরার ওই কথাটার বলার পেছনে দুটো কারণ আছে। আহাম্মক কথাটার ভেতরেই অপমানটা ছিল, কিন্তু সেটা আমার গায়ে লাগে নি। কারণ আমাকে তাতাবার জন্যেই ওই কথাটা সে বলেছে। কিন্তু বুড়ো কথাটা সম্পর্কে তো তা বলা যায় না। অপমানের উদ্দেশ্যে নয়, এক্ষেত্রে যা ঘটনা তাই-ই বলেছে সে। যেমন কিনা, পঞ্চাশ বছর না হয়ে আমার বয়েস যদি ষোল বছর হত, সেক্ষেত্রে সে বলত আহাম্মক ছোঁড়া কোথাকার। সবার চোখেই, তাতে আইওলেও বাদ যায় না, আমি বৃদ্ধ ছাড়া কিছু নই। সেই ছোকরার চোখে আমি আহম্মক আর আইওলের চোখে আমি বুদ্ধিমান কি বুদ্ধিমান নই, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। হয়ত আইওলের ওই সীটটাতে বসবার দরকার হত না। কেননা ওই ছোকরা হয়ত আমার বয়সের কথা ভেবেই সীটটা ছেড়ে দিত।

অনুমানটা যে সত্যি তার প্রমাণও মিলল। এক ভদ্রলোক এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিলেন, এখন মুখ খুললেন: 'কী অভদ্র ছেলেটা···ওর তো সীটটা আপনার বয়সের কথা বিবেচনা করেও ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেল। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আয়নার অভাবে মুখে হাত বুলিয়ে বয়েসটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলাম। আইওলে অবশ্য এসবের কিছুই টের পাচ্ছিল না। অস্তিয়া যেতে যেতে মাঝামাঝি রাস্তায় সে আমায় বললেঃ 'আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, এত খারাপ লাগছে।' না বলে পারলাম না: 'দ্যাখো আমি বুড়ো হয়েছি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আধঘণ্টা টাক সময় ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো। মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল আইওলে হয়ত বলবে: 'আপনি বুড়ো হয়েছেন, কি বলছেন?' কিন্তু সে রকম কিছুই সে বলল না। সন্দেহ রইল না যে সত্যি কথাটাই আমি বলে ফেলেছি।

অস্তিয়ায় এসে আইওলেই আগে পোশাক পালটে নিল। স্নানের পোশাকটা ওর গায়ে এমন আঁটসাঁট হয়েছে যে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি ফেটে যাবে। আইওলের শরীর যেমন ধবধবে শাদা আর সতেজ তেমনি বাঁধুনিও খুব ভালো। যৌবন ওর অঙ্গে এত বেশী যে, মেজাজ রীতিমত খারাপ হয়ে যায়। এরপর আমি গেলাম পোশাক পালটাতে ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেয়ালে ঝোলানো ভাঙা আয়নাটায় নিজের চেহারাটা দেখে নিলাম। বাস্তবিক আমি বুড়ো হয়েছি। আশ্চর্য, এদ্দিন ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি আমার? এক নজরেই চোখে পড়ল, স্তিমিত চোখ দুটো কপালের বালিরেখায় ভাল করে দেখাই যায় না, চুলে বেশ পাক ধরেছে, গালের চামড়া ঝুলে পড়ছে দাঁত হলদে হয়েছে। গায়ের গলা-খোলা শার্ট, যুবকদের পক্ষে যা খুবই মানান সই, এখন দেখে লজ্জাই লাগল। এটা পরায় পুরো গলাটা দেখা যাচ্ছে। গলার ভাঁজ চোখে পড়ছে। জামাকাপড় খুলে নীচু হতেই পেটটা উঁচু হয়ে নেমে গেল—মনে হল একটা থলে যেন চুপসে গেল। রেগে নিজেকে নিজেই বলে উঠলাম, বুড়ো হাবড়া কোথাকার ভাবলাম, জীবন সত্যি কী বিচিত্র! মাত্র একঘণ্টা আগেও আইওলের সঙ্গে বিহারে বেরুনোর মত বয়েস আছে মনে হয়েছিল, আর এখন ওই ক'টা শব্দেই ব্যাপারটার মোড় ঘুরে গেল—মনে হল, আইওলের বাপের বয়েসী আমি।

দোকানে মেয়েটার দিকে এত বেশি করে তাকিয়েছি এবং তারপর বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি বলে এখন নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল। তাছাড়া, আইওলে আমাকে কী চোখে দেখছে তাই বা কে জানে!

পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম কি চোখে দেখছে। সমুদ্রের অস্থিরতা দেখে আমরা নিরাপত্তা-দড়িটা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। ঢেউ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিটা ঢেউ চলে যাবার পর আমি হাঁসফাঁস করছি। নিজের মনেই বললাম: 'বুড়ো হয়েছি বলেই এমন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে।' আইওলে কিন্তু খুব খুশী। খুশী গলায় চিৎকার করে বলল: 'সত্যি, আপনি যে এত আমুদে ভাবতেই পারিনি।' বললাম: 'কেন, ভাবতে পারোনি কেন?' আইওলে বললে: 'আপনার বয়েসী লোকেরা তো সাধারণত সমুদ্রে-টমুদ্রে আসাটা বড় পছন্দ করে না · ছেলে ছোকরারাই· 'ঠিক এমনি সময়ে বিরাট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের উপর। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লাম আইওলের ঘাড়ে। নিজেকে সামলে নিতে খপ্ করে চেপে ধরলাম আইওলের হাত—যেমন সুপুষ্ট ও নিটোল তেমনই যৌবনভরা ও নরম সেই হাত। মুখ-ভরতি নোনা জল নিয়েই চেঁচিয়ে বললাম: 'আমি তোমার বাপের বয়েসী, বুঝলে?' ফেনাময় জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলে আইওলে। বললে: 'বাপের নয়, বলুন কাকার বয়েসী।' স্নানপর্ব সমাধা হতে এমন বিব্রত আর লজ্জাবোধ করলুম যে মুখ দিয়ে কথা সরল না। কথা এমনভাবে আটকে গেল যে যন্ত্র ছাড়া বুঝি কাজ হবে না। আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল আইওলে। উরু আর বুক ঢাকতে স্নানের পোশাকটা টেনে দিলে। ভিজে গিয়ে অশ্লীল দেখাচ্ছে রীতিমত। এরপর মেয়েটা বেলাভূমির বালিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আইওলের শরীর এত নিটোল যে ভেজা বালি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গা থেকে পড়ে গেল। স্তব্ধভাবে পাশে বসে আছি। কথা বলার বা নড়াচড়ার ক্ষমতা যেন হারিয়ে ফেলেছি। আইওলের বোধশক্তি গণ্ডারের চেয়ে ভোঁতা হলেও, হয়ত আমার কাতর অবস্থাটা টের পেল। হঠাৎ বলল, আমার শরীর খারাপ লাগছে কিনা। বললাম: 'আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। আচ্ছা দোকানে আমাতো, গিউসেপ্পি আর আমি—এর মধ্যে কাকে তোমার সব থেকে পছন্দ? বেশ খানিকক্ষণ ধরে সে ভাবল। তারপর বলল: 'আমি তো আপনাদের তিনজনকেই পছন্দ করি।' আমি ছাড়লাম না। বললাম: 'কিন্তু, আমাতোর

বয়েস কম।' সে বললে: 'হ্যাঁ, ওর বয়েস কম বই কি।' একটু থেমে বলি: 'আমার তো মনে হয়, আমাতো তোমায় ভালোবাসে।' 'সত্যি? কই, আমি তো লক্ষ্য করিনি', সে বললে। দেখলাম আইওলে একটু অন্যমনস্ক। কিছু নিয়ে যেন ভাবছে। শেষটায় বললে: 'দেখুন আমার পোশাকের পেছনটাতে সেলাই খুলে গেছে··· তোয়ালেটা দিন তো, ভেতরে গিয়ে জামাটা পাল্টে আসি।' তোয়ালেটা দিলাম। সেটা পাছায় জড়িয়ে নিয়ে সে দৌড় লাগাল।

সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনদিন আইওলে বা অন্য কোনো মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবো না। সে কথার খেলাপও করিনি। আইওলে যেন একটু অবাকই হয়েছে। এক মাস এভাবে কেটে গেল। এই একমাসে বার চার -পাঁচেক ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ইতিমধ্যে গিউসেপ্পির সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে। গিউসেপ্পি ওর সঙ্গে অবিশ্যি বাপের মত ব্যবহার করে, কোন রকম ছ্যাবলামো-ফাজলামোর ধার দিয়ে যায় না। মনে হল, আমার বয়েস যেন আরো বেড়ে গেছে। দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি—চুল কাটি, দাড়ি কামিয়ে দিই, বকশিশ পকেটে পুরি। মুখ বুজে কাজ করে যাই। একদিন কাজ সারা হবার পর দোকানের পেছন দিকের ঘরটায় গায়ের অ্যাপ্রণটা খুলে রাখতে যাচ্ছি এমন সময় দোকানের মালিক এসে হাজির। মালিকের মনটা ভাল। তিনি বললেন: 'আজ সন্ধ্যায় যদি বিশেষ কোনো কাজ হাতে না থাকে তো সবাই মিলে একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাক···আইওলে আর গিউসেপ্পির বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।' দোকানের ভেতরে তাকালাম। দেখি এক কোণে তার প্রসাধনী টেবিলের সামনে বসে আইওলে মৃদু হাসছে, অন্যদিকে ক্ষুর সাফ করতে করতে গিউসেপ্পির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। হঠাৎ আমার বুকের চাপা পাষাণটা নেমে গেল। গিউসেপ্পির বয়েস আমার চেয়ে বেশি, তাছাড়া দেখতেও কুচ্ছিত। অথচ, আইওলে আমাতোকে না করে পছন্দ করল গিউসেপ্পিকে। দুহাত বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে গিউসেপ্পিকে সোচ্চারে অভিনন্দন জানালাম। তারপর আইওলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম ওর দুগালে। দোকানে তিনজনের মধ্যে আমিই সেদিন সবচেয়ে খুশী হয়েছিলাম।

পরদিন রোববার। বিকেলে একটু ঘুরে আসতে বেরোলাম। ঘুরতে ঘুরতে টের পেলাম, আগের মতই আমি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখছি, একজন একজন করে। এবং প্রত্যেক মেয়েরই সামনের ও পেছনের সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখছি।

□ চশমা □

পোশাক তৈরী করে নেসপোলা (আপেল জাতীয় এক ধরণের ছোট ফলের নাম নেসপোলা)। তার নাম নেসপোলা হবার কারণ, বামন গোছের এই মহিলাটির হলদে আর কালো রঙের মুখখানা ওই ফল টুসটুসে পাকলে যেমনটি হয়, অবিকল তেমনি। তার চোখ জোড়া চোখের নিচের রেখা, ভুরু এবং ছোটছোট গোঁফের রঙ কালো, আবার গাল, কপাল আর নাকের রঙ হলদে। নেসপোলার পোশাক দেখে সর্বদাই মনে হবে, বাচ্চারা মাটিতে মুখ হেঁচড়ে নিয়ে যায় এমন ছেঁড়াখোঁড়া পুতুলের কথা। পরনে বেশ আঁটসাঁট পোশাক। খাটো স্কার্ট পরে থাকায় তার মোটাসোটা পা দুটো চোখে পড়ে। ভিয়া দ্যেল আরানসিওর একটা তেতলার নিজের বাসায় বসে কাজ করে নেসপোলা। সেখানে তার তিনটে ঘর। একটা বেডরুম। তাতে বেশ বড়সড় একটা ডবল বেডের পালঙ্ক, তাছাড়া চতুর্দিকে জিনিসপত্র এমনভাবে গাদাগাদি হয়ে আছে যে নাড়াচাড়া করাই দায়। সেখানে আছে একটা মার্বেল-টপ্ দেরাজ আলমারি, আয়না লাগানো একটা ওয়ার্ডরোব, দুটো বেডসাইড টেবিল, এবং আরো বড় একটা টেবিল আর চেয়ার। এছাড়া একটা ছোটখাট ফিটিংরুম—তাতে তেকোণা কাঁচ বসানো, এছাড়া আর কিছুই নেই। সবশেষে ছোট্ট বেডরুম একটা—নেসপোলার ছেলে নাতালে শোয়। ঘরটা থেকে একটা ব্যালকনি বেরিয়েছে—ল্যাভেটরি আর কিচেনের মাঝখানে। ব্যালকনি থেকে নিচের কোর্টইয়ার্ড দেখা যায়। বেডরুমে বসে কাজ করার অভ্যাস নেসপোলার। বেতের তৈরী বাচ্চাদের একটা আরামকেদারায় বসে কাজ করত সে। ঘরে ঢুকে তাকে দেখার উপায় ছিল না। কারণ, পরদা আর জানালার মাঝখানে বসে কাজ করত সে। পাখি আর ঝুড়িভরতি ফুলের এমব্রয়ডারি করা পরদাটা টানা থাকত। তার ওই নিভৃত জায়গাটাতে আরামকেদারাটা ছিল, কাজ করার একটা টেবিল ছিল, আর ছিল খাঁচার ভেতরে একটা ক্যানারি পাখি। ডিজাইন করার বা কাটার সময়ে কাপড়টা বিছানার ওপর সে পেতে দিত। তারপর সুজনির উপর হাঁটু মুড়ে কাজ করতে করতে পোশাকটা

ঘোরাত। ফিটিংয়ের কাজ সারত পাশের ছোট ঘরটাতে-আগেই সেকথা বলা হয়েছে। কাপড় ছেড়ে রেখে খদ্দের কাঁচের সামনে দাঁড়াত, একটা স্ূচ বা পিন মুখে নিয়ে নেসপোলা একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে তার উচ্চতাটা ঠিক করে নিত। পোশাকের ফিটিংসের কাজ করতে করতে অনর্গল কথা বলে যেত নেসপোলা। গোপন ও অন্তরঙ্গ স্বরে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলত সে। বেশির ভাগ সময়টা নেসপোলা নীচু গলায় খদ্দেরদের প্রশংসার বাণী শোনাত—গায়ের চামড়া কী ধবধবে ফরসা, কী সুন্দর চুল, চোখের রঙ কত মনোরম, গড়ন কেমন চমৎকার এ ধরনের সব প্রশংসাবাক্য। আর খদ্দেরটি সত্যিই যদি আকর্ষণীয়া হয় তো কথাই নেই, ছেলেকে ডেকে এনে হাজির করবে: 'আয় নাতালে দ্যাখ, মেরী মাতা যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছেন রে।' নেসপোলার খদ্দেররা অধিকাংশই পাড়ার অতি সাধারণ মেয়ে। তারা এসবের প্রতিবাদ-টতিবাদ করতো না, বিশেষত নাতালেকে দেখে ভয় খাবার মতো কিছু ছিল না। নেসপোলার প্রশংসায় আর যাই থাক না থাক আন্তরিকতা থাকত, তাই খদ্দের জুটতে দেরী হত না ওই একই বাড়িতে বা কাছাকাছি থাকত এমন অনেক মেয়েই আসত তার কাছে।

আমি এত সব জানতুম কারণ নাতালে আর আমি এক সময় বন্ধু ছিলুম, আর তখন প্রায়ই নেসপোলার বাসায় যাতায়াত করতুম। নাতালে সে সময় কাজ খুঁজছে। শেষমেষ যেখানে আমি মেকানিকের কাজ করতুম সেখানটায় একটা কাজ জুটেও গেল। কিন্তু মাস দুই যেতে না যেতেই সে বললে উন্নতির রাস্তা এটা নয়, এবং কারখানার কাজটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইল। নাতালের ওই উন্নতির কথাটা শুনে বেশ অবাক লাগল, কারণ ওই ধরনের কাজে নিছক জীবিকা নির্বাহ ছাড়া আর কোন রকম উন্নতির কথা কখনো ভাবিনি। এই কারণে এবং আরো যেসব কথাবার্তা সে বলত তাতে মনে বেশ কৌতুহল হওয়ায় ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিনি। অথচ, সত্যি বলতে কি, ছেলেটাকে বিশেষ সুবিধের বলে কখনো মনে হয়নি। নাতালের চেহারাটা বিশাল এবং পেশল। তার ফোলা ফোলা ফ্যাকাশে মুখটা দেখে কেন যেন একধরণের মাছের কথা মনে হত। কিন্তু চোখে গোল ফ্রেমের পুরু চশমা থাকায় এবং মুখের ভাব গম্ভীর হওয়ায় লোকে তাকে 'প্রোফেসর' বলে ডাকত। যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডীও সে পেরোয় নি তবু তার গম্ভীর মুখ আর

রাশভারী আচার-আচরণ দেখে লোকের মনে বিশ্বাসের ভাবই জাগত। এবং আমাদের কারখানায় কাজ করতে আসার আগে যেসব কাজ সে করেছে—যেমন, মেসেঞ্জার, কেয়ারটেকার, কপিষ্ট-এর কাজ-টাজ সেসব কোনোটাই কারিগরের কাজ নয়, কেরাণীরই কাজ। ওই সমস্ত কাজ বিশ্বাসের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। চশমা পরা ওর পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানা সেই বিশ্বাসই জাগাত। আর এখানেই যত গণ্ডগোল। কেননা নাতালে ওর আগেকার সব চাকরিগুলো খুইয়েছে কোন না কোন সময়ে মারাত্মক সব গলদের জন্যে—আর সেসব গলদ হয় ছিঁচকে চুরি কিংবা প্রতারণা, নয়ত স্রেফ চুরি চামারি। সর্বত্রই একইভাবে ব্যাপারটা ঘটত। মনিব প্রথমে ওকে বিশ্বাস করতেন, ওর সততা সম্পর্কে কোনও সংশয়ই থাকত না তাঁর মনে। এমন কি সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত ওর হাতে তুলে দিতেন তিনি। এরপরই কেউ কিছু বোঝবার আগেই মনিব চাকরি থেকে ওকে ছাড়িয়ে দিতেন। এবং ভাগ্যের মতই অমোঘ সেই মন্তব্যটা শুনতে হত ওকে: 'নাও বিদেয় হও, আর এ মুখো হোয়োনা · তোমার মায়ের পুণ্যে এ যাত্রা তবে গেলে মনে রেখো, পুলিশের হাতে তুলে দিলাম না।' এসব কথা আমি জানতাম, আবার জানতামও না। ওদের বাসায় গিয়ে কিছুই বার করার উপায় ছিল না। কোনো কথাই ফাঁস হত না। নেসপোলাকে দেখা যেত যথারীতি সদা ব্যস্ত। বড়জোর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়া ছাড়া আর কোন অভিযোগই তার শোনা যেত না আর নাতালেকে তো মুখের ওপর থুথু ফেলে দিলেও ভারি বয়ে যেত। মোট কথা, বাইরে থেকে কিচ্ছুটি বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধে হত না, লোকচক্ষুর আড়ালে একজন শুধু চোখের জল ফেলত হা-হুতাশ করত, আর অন্যজন নতুন জীবন শুরু করার শপথ নিত। এবং নতুন কাজ পেয়ে আবার যথারীতি যে কে সেই।

নাতালেকে দেখে কিন্তু খুব একটা শক্তিশালী বলে মনে হত না। নীতিদীর্ঘ চেহারাটা মনে হত অতি ভোজনে মেদ বহুল—জামাকাপড় সবসময়ই গায়ে এঁটে আছে। আসলে কিন্তু ছেলেটা ছিল ষাঁড়ের মতই বলশালী। কারখানায় তাকে আমি একা ছোটখাট একটা মোটরগাড়ি তুলতে দেখেছি। গাম্ভীর্য আর স্থৈর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকত তার ঐ শক্তি এবং এটাকে তার আসল চরিত্রের একটা প্রতীক হিসেবেই ধরা যায়। আসলে নাতালে ছিল যাকে বলে হামবাগ একটা—বাইরে একরকম, ভেতরে অন্যরকম। একমাত্র তার মা-ই ছেলের

আসল চরিত্রের খোঁজ রাখতেন। কয়েক বছর আগে নেপ্‌লসে গিয়ে যে কাণ্ড সে করে আসে তাতেই মহিলার চোখ খুলে যায়। সে সময়টায় উত্তরাঞ্চলে তখনো যুদ্ধ চলছে। নাতালেও ঘরছাড়া গরু হয়ে যায়নি। তাছাড়া চশমা পরা অনুতপ্ত গোছের মুখখানা নিয়ে দিব্যি মাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। মাকে ও মার জনা কয়েক বান্ধবীকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নেয় নাতালে। বলে, নেপ্‌লসে গিয়ে সে নাকি মেয়েদের জুতো কিনে আনবে। কারণ রোমে তখন মেয়েদের জুতোর অসম্ভব চাহিদা। কাজেই জুতো কিনে এনে বেশি দামে বিক্রি করে বড় লোক হবার এই হল স্বর্ণ সুযোগ। ওই বিল্ডিংয়ের সর্বত্র যে করেই হোক খবর ছড়িয়ে পড়ল যে নাতালের ব্যবসার দিকে বেশ একটা ঝোঁক আছে। ওই সোজা সরল মেয়েগুলো ওকে কিছু না কিছু টাকা দিয়ে দিলে। ওর মা ছেলের হাতে তুলে দিলে সারাজীবনের সঞ্চয়। মোটরে চেপে নাতালে গেল নেপ্‌লসে। কিন্তু ফিরে এল জুতো না নিয়েই। এমন কি গায়ের জ্যাকেটটা পর্যন্ত তার হাতছাড়া হয়ে গেল। নাতালে বললে, ফরমিয়া পর্যন্ত যাবার পর দস্যুরা নাকি তাকে আক্রমণ করে। তবে দুঃখের বিষয়, যে মোটরে করে সে নেপ্‌লসে গিয়েছিল সেই গাড়ির ড্রাইভারই কিছুদিন বাদে আসল কথাটা ফাঁস করে দেয়। নেপ্‌লসে গিয়ে নাতালে পাড়জুয়াড়ী কিছু নেপ্‌লসবাসীর পাল্লায় পড়ে। সকলে মিলে জুয়ো খেলায় মেতে ওঠে। খেলায় নাতালে হেরে যায়। শুনেছি, এ ঘটনার পর নেসপোলা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যারা নেসপোলাকে বিশ্বাস করেই টাকাগুলো দিয়েছিল তাদের কথা ভেবেই মহিলা ভেঙে পড়ে। নেসপোলা পণ করল তার বান্ধবীদের টাকা সে ফেরৎ দেবে এবং বহু বছর অনেক কষ্ট স্বীকার করে তবেই সেটা সম্ভব হল। নাতালের কিন্তু কোনও বিকার নেই। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব। তবে আমার ধারণা, এরপর তার মা তাকে আর কোনদিন বিশ্বাস করেনি।

তারপর থেকেই নাতালে জুয়াড়ী। খেলার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ নয়, জুয়াখেলায় সে নামে অন্য কারণে। খুব ছোট বয়েস থেকেই নাকি তার জ্ঞান হয়, নিছক সততার জোরে গরীবের পক্ষে খুব বেশি দূর উন্নতি করা সম্ভব নয়। একমাত্র ভাগ্যই নাকি পারে কপাল ফেরাতে। জীবন সম্পর্কে এবং জীবনে সাফল্য সম্পর্কে তার ছিল নিজস্ব ধ্যান ধারণা, আর সেই ধ্যানধারণার কথা সে বেশ সাগ্রহেই বুঝিয়ে বলত। আগেই বলেছি, আমাদের কারখানার কাজ

ছেড়ে দেবার পরও তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আমি ছাড়িনি। কারণ, তার চিন্তাভাবনা আমার কৌতূহল জাগাত। তাছাড়া, অধ্যাপকের মত দেখতে এই চোর, মাঝ বয়েসীর মত দেখতে এই যুবক, বিদ্বানের মত দেখতে এই গোমুখ্যুকে দেখে এক দিকে যেমন প্রচণ্ড রাগ হত, অন্যদিকে তেমনি বিষম বিস্ময়বোধ করতাম। নাতালে বলত, জীবনে সব কিছুই নির্ভর করে ভাগ্যের ওপর। ভাগ্যকে যে ধরতে পারে সে-ই পায় তাকে। তাছাড়া, ভাগ্যের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিতেও হয়। সব কিছু নির্ভর করে তৈরী থাকা এবং তাড়াতাড়ি কাজ করার উপর। সঠিক সময়টি বেছে নিয়ে ঠিক মতো ঘা মারা চাই। অবিশ্যি পরিতাপের কথা হল, ঘা মারার অত্যুৎসাহে সব রকম সূক্ষ্মতাকেই বিসর্জন দিয়ে সে কাজ ঝাঁপিয়ে পড়ত। নাতালে এমনভাবে কথা বলত যেন একেবারে বেদবাক্য উচ্চারণ করছে। চশমার ভেতর দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে এমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলে যেত যা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। মনে হত, সে যেন মোটেই হতভাগালোক নয়, ভাগ্যের চুলের মুঠি যেন তার হাতের মুঠোয়। ছোকরার কথাবার্তা শুনে রীতিমত মাথায় রক্ত চড়ে যেত। একদিন আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম: 'তা তুমি কোন্ রাজত্ব উদ্ধার করেছো শুনি?' এককথায় বিন্দুমাত্র দমে না গিয়ে (এমন উঁচুদরের ধাতুতে গড়া তার মুখখানা) কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলে সে বললে: 'আমার করাকরিতে কি এসে যায়?··· তাছাড়া রোম তো একদিনেই তৈরী হয়নি।'

রোম তৈরী হবার অপেক্ষায় থাকার সঙ্গে সঙ্গে নাতালে কিন্তু তার ভাগ্যান্বেষণের কাজও চালিয়ে যেতে লাগল। যত্রতত্র যার তার সঙ্গে তাস খেলে বেড়াতে লাগল সে। বেশির ভাগ সময় অবিশ্যি বাড়ির কাছেই একটা মিল্কবারের পেছনের ঘরে বার বন্ধ হবার পর রাত্তিরে বসে খেলত। বারের কর্মচারী দোকানের খড়খড়ি টেনে দিয়ে মেজেতে কাঠগুঁড়ো ছড়িয়ে দিত, কাউণ্টার পরিষ্কার করে নিত। দোকানের মালিক ও ওয়েটার এবং আরেকটি লোকের সঙ্গে খেলত নাতালে। তা খেলায় জিতত, না হারত সে? খুব সম্ভবত মাঝে মধ্যে জিতত, তা নয়ত জুয়ো খেলার পয়সা তার আসত কোত্থেকে? তবে আখেরে হারই হত তার। কারণ, নাতালে গরীব, সামান্য পোশাক বানিয়ে তার মা। বাকি তিনজনের পয়সাকড়ির জোর তার চেয়ে বেশিই ছিল। কাজেই লোহার পাত্রের পাশাপাশি সে ছিল মাটির পাত্র

বিশেষ। খেলায় হেরে গিয়ে পয়সার ধান্দায় চাকরি পেলেই আবার তাকে বিশ্বাসভঙ্গ করতে হত। চুরি চামারি করে তা বেচে দিত। হঠাৎ চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পেছনে ওটাই ছিল রহস্য। এবং বরখাস্ত হবার পর যেসব কথা শুনতে হত তাকে, সেসব শুনলে লজ্জায় নিগ্রোর পর্যন্ত কান লাল হয়ে যাবার কথা। কিন্তু নাতালের ওসবে কিছুই হত না। অন্যান্য অনেক মা যেমন তাদের ছেলেকে বলে থাকে: 'মেয়েদের পেছন ছুটিস নে বাবা' কিংবা 'খেলাধুলো করে সময় নষ্ট করিস নি বাপু', নাতালের মা তার ছেলেকে অমন ধারা কিছুই না বলে খালি বলত: 'ওই তাস খেলা তুই ছেড়ে দে, সোনা মানিক আমার।'

নেসপোলা তার ছেলেকে সোনার টুকরো ছেলে বলত। কারণ, চোর জোচ্চোর যাই হোক, হাজার হলেও নাতালে তার পেটের ছেলে। তাছাড়া তার আশা ছিল একদিন না একদিন নাতালে তার ভুল শুধরে নেবে, সৎ পথে জীবন যাপন করবে। কিন্তু সব আশায় ছাই দিয়ে একদিন সকালে নেসপোলার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই সোনার টুকরো ছেলে এক টুকরো লোহা ঢুকিয়ে ওয়ার্ডরোবের তালা ভেঙে মার টাকা-পয়সা যা ছিল হাতড়ে নিলে। অনুমান করতে পারি, তার মাকে পরে সে এই বলে বুঝিয়েছে যে সে আর একবার মাত্র এক হাত খেলে সব টাকা চতুর্গুণ করে ফেরত দেবে ভেবেছিল কিন্তু যথারীতি হেরে গেছে। টাকা-পয়সা যা গেছে তা তো গেছেই ভেবে নেসপোলা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, এবং এ ধরনের ব্যাপার তার গা সহা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই লোহার টুকরো—ওটা যেন নেসপোলার হৃদপিণ্ডকে বিদ্ধ করে দিলে। তারপর থেকেই মহিলা এমন মনমরা হয়ে পড়ল যে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে খদ্দেরের পোশাক পরাতে পরাতে প্রশংসার কথাগুলো পর্যন্ত বলতে ভুলে গেল।

একদিন নাতালে সন্ধ্যের দিকে বাড়ি এসে মাকে জানাল চাকরির খোঁজে সে একটু ঘোরাঘুরি করছিল। চোখে তার চশমা ছিল না। সে বললে একটা কাফেতে খবরের কাগজ পড়বার জন্যে সেটা সে খুলেছিল, সেখানেই ফেলে এসেছে সেটা। ভালোভাবে কিছু পড়তে হলে সে সবসময়ই চশমাটা খুলে সরিয়ে রাখত—হয় ভেঙে যাবার ভয়ে আর তা নয়তো কাছের থেকে চশমা ছাড়াই সে ভালো দেখতো বলে। শোবার ঘরে জানলার ধারের ছোট কাজ করার টেবিলে

ওপর নেসপোলা যথারীতি রাত্রির খাবার সাজিয়েছে। নাতালে একপ্লেট সেমুইর খাবার সাবড়ে দিল, তাছাড়া একপ্লেট বীট পালংয়ের মূল ভাজা ও লম্বা রুটির রোল পেটে চালান করে দিলে। নাতালের খুবই খিদে পেয়েছিল। নেসপোলা পরে বলে, ছেলেকে অমন খিদে নিয়ে খেতে আগে সে কখনো দেখে নি। খাওয়া দাওয়া সেরে নাতালে একটা সিগারেট ধরালে। তারপর বিরাট ডাবল বেডের বিছানায় ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিলে। ঘুম থেকে উঠে মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কাছের একটা সিনেমায় গেল একটা মার্কিনী কমিক ছবি দেখতে। আমি নিজেও ছবিটা দেখছিলাম। দেখলাম নাতালে সামনের দিকের একটা সীটে বসে আছে। চোখে ওর চশমা নেই। থেকে থেকে দমকে দমকে এমন হাসছে যে মনে হয় বুঝি বা কাশছে।

কাহিনী আর দীর্ঘ করব না। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসামাত্র পুলিশ নাতালেকে গ্রেপ্তার করে। নেসপোলার বাসায় গিয়ে এর আগেই তারা নাতালের খোঁজ করেছিল। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। পরদিন সকালে সমস্ত খবর কাগজেই খবরটা বেরোয়। ভাড়া দিতে গিয়ে সুযোগ বুঝে নাতালে বুড়ো বেতো বাড়িওলার মাথায় হাতুড়ির বাড়ি বসিয়ে দেয়। নিখুঁতভাবে কাজ হাসিল করতে গিয়েই সে ধরা পড়ে যায়। ঠিক মতো হাতুড়ি চালাবার জন্যে নাতালে চশমাটা খুলে জানালার কাছে রেখেছিল, তারপর উত্তেজনার মাথায় চশমাটা ফেলে রেখেই চলে আসে। পুলিশের সেটা নজরে পড়ে যায়। বেচারা নেসপোলা। নাতালে সম্পর্কে এবার মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিল সে, কিন্তু সেদিন সকালে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল মস্ত বড় বিস্ময়। সংবাদপত্রগুলি যখন নেসপোলা আর তার ছেলেকে নিয়ে আলোচনা করে চলেছে তখন গোড়ার দিকে তার মনের অবস্থার কথা আমার জানা নেই। তবে পরের দিকে নেসপোলা মেরী মাতার কাছেই যে প্রার্থনা জানিয়েছিল, সেটা অনুমান করা যায়। কারণ, ধর্মপ্রাণা ছিল নেসপোলা। আর মেরী মাতাও সে প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তার মনে জীবনের নিষ্ঠুর পথে চলার সাহস এনে দেন। ওই ঘটনার পর কিছুকাল কেটে গেলে নেসপোলা তার ছেলেকে দেখতে যে জেলখানায় গিয়েছিল সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। গম্ভীর ভাব এবং ভাল ব্যবহারের জন্য নাতালেকে জেলখানার হাসপাতালে একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল, নেসপোলার মনে তখন এটুকুই সান্ত্বনা।

□ নার্স □

উদ্যান শহরে আমার ফুলের নার্শারী আছে। রোজ সকালে বাসে করে ভিয়া নমেন্তনা ধরে যেতে যেতে সেণ্ট অ্যাগনেসের গির্জা পেরিয়েই বিশেষ একটা ভিলার লোহার দরজার দিকে না তাকিয়ে পারি না। বছর কয় আগে এই ভিলাতেই আমি মালীর কাজ করতুম। আমিই এখানে জুঁই ফুলের গাছ চারিদিকের দেয়ালে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সদর দরজার সামনের খোলা জায়গাটায় ক্যামেলিয়া বসানো বড় বড় টবগুলো আমিই সাজিয়েছি। আমিই বাড়ির দেয়ালে উইস্টারিয়া তুলে দিয়েছিলাম। এবং এর মধ্যে মরে গিয়ে না থাকলে তার এখন তেতলা অব্দি পৌঁছে যাবার কথা। বাড়ির মালিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভি'লার বাগানটার এমন হতশ্রী চেহারা হয়েছিল যে সেটাকে আবর্জনা ফেলার জায়গা বলেই মনে হত। কিন্তু অসুস্থ ভদ্রলোকের দেখা-শোনার ভার ছিল যে নার্সটির ওপর, তার প্রতি ভালোবাসার দরুন আমি ওই জায়গাটাকেই সবুজ-শ্রী মণ্ডিত করে তুলেছিলাম—তৈরি করেছিলাম উদ্ভিদের কাঁচঘর, ঘাসের জমি, কাঁকর বিছানো পথ, লাইলাকের ঝোপ, এবং ফ্লাওয়ার বেডের চারধারে ও পথ ধরে নিখুঁত ছাঁটা ঝোপঝাড়ের বেড়া। মনে আছে, নেলার জানালার খুব সামনেই খানিকটা জায়গার মাঝখানে পুঁতে ছিলাম গ্রাণ্ডিফ্লোরা জাতের সুপুষ্ট একটা ম্যাগনোলিয়া, বসন্তকালে ফুলের গন্ধ যাতে ওর ঘরে ঢোকে। এবং ওর জানালার নীচেই একটা জ্যাপোনিকা পুঁতেছিলাম। খুব সুন্দর লতানো এক রকমের গাছ জ্যাপোনিকা, যার ডালটা কালো আর ফুলটা লাল। নার্স নেলাকে আমি ভালোবাসতাম। মেয়েটার চেহারাটা বেশ শক্ত সমর্থ। খুব লম্বা নয়। মাথায় লাল লাল চুল। সতেজ চওড়া মুখ। চোখে চশমা। ওর ওই শক্ত সবল চেহারাটা দেখে মনে হত, স্বাস্থ্যেভরা শরীরের চাপে শাদা পোশাকটা বুঝি ফেটে যাবে। আর এ দেখেই নিমেষে মেয়েটা আমার মনে ধরে গেল। অবিশ্যি চশমাপরা ওর বুদ্ধিদীপ্ত শান্ত মুখখানাও আমার মনকে টেনেছিল। নেলাকে দেখতে লেডি ডাক্তারের মত। মোদ্দা

কথা, ওর মুখের ওই গম্ভীর ভাব আর যৌবনোচ্ছল শরীরের মধ্যে যে দুস্তর ফারাক তাই আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

নেলা যে ভদ্রলোকের সেবা শুশ্রূষা করছে তার শরীর স্বাস্থের গুরুত্ব আমার কাছে তখন আমার নিজের চেয়েও ঢের বেশী, কারণ ভদ্রলোক যদি সেরে ওঠেন বা মারা যান তবে নেলাকে অত সহজে তো আমি আর দেখতে পাবো না। কাজেই সেই বসন্তকালে প্রতিদিন ভোরবেলা অসুস্থ ভদ্রলোকের ঘরের জানালা খুলে নেলা যখন বাগানের দিকে তাকাত, আমি তখন কোন না কোন ছলে জানালার ঠিক নীচে এসে দাঁড়াতাম এবং সাগ্রহে শুধোতাম: 'কেমন আছেন উনি?' একটা ভঙ্গি করে সে জানাত 'মোটামুটি' এবং দুষ্টুমিভরা হাসি। কারণ সে ভাল করেই জানত আমার অত উদ্বেগের আসল কারণটা কি। সারা সকালটা ওকে প্রায়ই দেখতে পেতাম। ওই জানলাটা দিয়েই দেখা যেত হয় গেলাসে ওষুধ ঢালছে, নয়ত ইঞ্জেকশন দেবার আগে সিরিঞ্জের সূঁচটা পরখ করে দেখছে। হাত নেড়ে ওকে আমি ইশারা করতাম, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে মাথাটা শুধু এমন ভাবে নাড়ত যার মানে দাঁড়ায়: 'দেখছো না আমি ওর ঘরে?' নেলা তার কাজ এত মন দিয়ে করত যা কোনো পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তাছাড়া তার কাজকে সে এমন ভাবে কাজে লাগাত যাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

বাড়ির খোলা জায়গাটাতেই সকালটা সাধারণত কাটিয়ে দিতুম। কারণ, অসুস্থ ভদ্রলোকের জানালাটা ওখান দিয়েই দেখা। বিকেলের দিকে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে কাজ করতুম। কারণ, ওই সময়টায় ভদ্রলোক খেয়েদেয়ে ঘুমোতেন। এবং সেই সুযোগে নেলা আমার সাথে এসে দেখা করত। একটা ঝোপের আড়ালে দেয়ালের লাগোয়া ফোয়ারার কাছেই হত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ। প্রায় প্রতিদিন বেলা দুটো তিনটে নাগাদ নেলা আসত, এবং আধঘণ্টা কি ঘণ্টা খানেক থেকে চলে যেত। গার্ডেনিয়া, ক্যামেলিয়া কিংবা গোলাপ এ ধরণের দু একটা ফুল কেটে ওর হাতে তুলে দিতুম। সেও আমাকে খুশী করবার জন্য ফুলটা ওর বুকে পিন দিয়ে আটকে পরে নিত। এরপর ফোয়ারার ধারে গিয়ে সে বসত। আর আমি তখন ওকে প্রেম নিবেদন করতাম। বাস্তবিক গভীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম—একবারে প্রথম থেকেই। নেলাকে বলতাম, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। চুপচাপ

সব কথা আমার শুনে যেত সে-চোখে সেই দুষ্টুমির হাসি। বলতাম: 'শোনো নেলা, তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি। অনেকগুলো ছেলে পুলে হবে আমাদের। বছর বছর একটি ক'রে। ভেবে দ্যাখো, আমাদের বাচ্চা কত সুন্দর হবে দেখতে। তুমি তো সুন্দরী, আর আমি দেখতে নেহাত খারাপ নই।' হাসত নেলা। বলত: 'বুঝলুম।...কিন্তু কি খাওয়াব ওদের শুনি?' বলতুম: 'কেন, আমি কি বসে থাকব নাকি? একটা ফুলের নার্শারী খোলার ইচ্ছে আছে আমার?' সে বলত: 'আমি কিন্তু নার্সই থাকতে চাই।' বলতুম 'নার্স না আর কিছু। আমার বউ হবে তুমি।' নেলার জবাব: 'হ্যাঁ নার্সই থাকতে চাই আমি। ছেলেপুলের দরকার নেই আমার। অসুস্থ লোকেরাই আমার ছেলেপুলে।' হাসিমুখেই কথাগুলো বলত সে। তাছাড়া তার হাত ধরতে বাধাটাধা দিত না। কিন্তু এটা সেটা কথার পর যেই চুমু খেতে গেছি, আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বলেছে: 'ওঁর কাছে যেতে হবে।' বলেছি: 'ঘুমোচ্ছেন হয়ত উনি।' 'হয়ত ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু যদি জেগে দেখেন যে আমি ওখানে নেই তবে ভয়ানক মুষড়ে পড়বেন, এমন কি মারাও যেতে পারেন। আমি ছাড়া আর কেউ ওঁর কাছাকাছি থাক, এটা উনি চান না।' এসব কথা শুনে লোকটার উপর মেজাজটা বেজায় খাপ্পা হয়ে যেত আমার। যদিও ওর দৌলতেই নেলার সঙ্গে আমার পরিচয়। ভদ্রলোকের কাছে চলে যেত নেলা। আর আমি রাগে ফুসতে ফুসতে কাঁকর বিছানো জমি সমান করতে গিয়ে এমন জোরে যন্ত্র চালিয়ে দিতাম যে নুড়ি শুদ্ধ মাটি উঠে আসত।

আমাকে কিন্তু নেলা একবারও চুমু খায়নি। তবে মাঝে মাঝে চুলের তারিফ করলে বাধা সে দিত না। চোখ ছাড়া চুল ছিল তার দেখবার মত। ওকে বলতাম: 'তোমার চুলগুলো একবারটি দেখি তো।' 'সত্যি ভারি বিরক্ত করো তুমি।' মৃদু প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলত সে। তবে শেষ অব্দি তার মাথায় জড়ানো রুমাল ও তারপর এক এক করে পিনগুলো খুলে নিতাম—বাধা সে দিত না। কিছুক্ষণ ধরে তার মাথার গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ঘন চুল তাম্র-মুকুটের মতই দেখাত। তারপর একটা নাড়া দিতেই চুলগুলো কাঁধ বেয়ে লুটিয়ে পড়ত একেবারে তার কোমর অব্দি। চুপচাপ চশমার ভেতর দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকত নেলা। আস্তে আস্তে আমি ওর চোখের চশমাটাকে

খুলে নিতাম। চোখে চশমা থাকলে ওকে কেমন যেন সহজ মনে হত না। অথচ চশমা ছাড়া ওর বড় বড় দুটি চোখের কোমল ও তরল চাহনি আর বাদামী রঙের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ভাব ফুটে উঠত, যা ছিল একাধারে অলস ও আকর্ষণীয়। দূর থেকে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে। শেষটায় কিছুটা বিব্রতভাবে রুমালটা আবার মাথায় জড়িয়ে নিয়ে চশমাটা পরে ফেলত সে।

নেলার এমন গভীর প্রেমে পড়ে গেছি তখন যে, মনে আছে একদিন তাকে বলেছিলাম: 'একেক সময় ভাবি, আমিও যদি অসুস্থ হয়ে পড়তুম·· তুমি আমার দেখাশুনো করতে।' জবাবে হেসে বলত সে: 'তোমার মাথা খারাপ। দিব্যি সুস্থ শরীরে আছো, আর তুমি কিনা চাইছো অসুস্থ হতে। বলি: 'সত্যি চাইছি—তাহলে একটু পর পরই আমার কপালে হাত দিয়ে তুমি দেখতে জ্বর আছে কিনা—ভোরবেলা গরম জলে আমার মুখ ধুয়ে দিতে · যখনই দরকার হত প্যান হাতে ছুটে আসতে তুমি, আর যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে অপেক্ষা করতে।' শেষের কথাটা শুনে হেসে ফেলত। বলত: 'সত্যি হাসালে তুমি। তোমার কি ধারণা, আমরা নার্সরা এসব কাজ করতে ভালবাসি?' বলতাম: 'না তা মনে করি না। নার্স বা রোগী কারোরই এসব ভালোলাগার কথা নয়। তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল।'

ইচ্ছে করলে আরো অনেক কথাই বলতে পারি, কারণ এটা সকলেই জানেন, প্রেমের ব্যাপারে সামান্যতম জিনিসেরও গুরুত্ব অসীম। বিশেষ করে আমার মতো ক্ষেত্রে তো বটেই, যেখানে প্রেম প্রথম ধাপেই স্তব্ধ হয়ে গেছে, এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। একদিন শুনলাম, অসুস্থ ভদ্রলোক নাকি সেরে উঠছেন, শিগগীরই বিছানা ছেড়ে উঠবেন। একথা শুনে আমি বিয়ের ব্যাপারে নেলাকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলাম। কিন্তু নেলা নানান ছলছুতো করে এড়িয়ে যেতে লাগল। প্রথমে বললে, আমায় সে পছন্দই করে। তারপর বললে, এখনো নাকি আমাকে তেমন ভালোবাসতে পারে নি। ভাবলাম এই ইতস্ততভাব আত্মনিবেদনেরই পূর্বসূচনা, অনেকটা কাটা গাছ পড়ে যাবার আগের টালমাটাল অবস্থার মত: এরপর একদিন বিকেলে শান্তভাবে ও বললে: 'আজ রাত্তিরে আমার জানালার নীচে একবারটি আসতে পারবে? মাঝ রাত্তিরের পর এসো—কথা আছে।' কথাটা শুনে তো প্রায় লাফিয়ে উঠি—নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা লুকিয়ে রইলাম। মাঝরাত্রির অপেক্ষা। সেই ঝোপের আড়ালে ফোয়ায়াটার ধারে বসে আছি। ঠিক সময়ে ওর জানালানর নীচে গিয়ে হাজির হলাম, এবং কথামত শিস দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জানালার খড়খড়ি খুলে গেল। অন্ধকার পটভূমিতে দেখা গেল সাদা পোশাক পরা নেলাকে। ফিস-ফিসিয়ে সে বললে: 'হাতটা বাড়াও, শিগগীর!' কিন্তু আমি তৈরী হবার আগেই সে জানালা গলে আমার দুহাতের মধ্যে এসে পড়েছে, আর তার ভারী শরীরের চাপে দুজনে মিলে মাটিতে গড়াগড়ি যাবার যোগাড়। যাই হোক, সামলে নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে চললাম। নীচু গলায় নেলা আমায় বললে 'আচ্ছা লিওনেলো, তুমি সত্যি সত্যি আমায় বিয়ে করতে চাও তো?' একথা শুনে, বিশেষ করে বলার তার কোমল ধরণটিতে, নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। হাঁটু গেড়ে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম, ওর জামায় মুখ ডুবিয়ে দিলাম। আমার মাথায় সস্নেহে ও টোকা দিতে লাগল। গভীর ভাবে অভিভূত হলেও শান্তভাবে নিজেকে বললাম: 'এখন আমরা শুধু দুজনে, এটাই সত্য। ঠিক তক্ষুণি নেলার ঘর থেকে ভেসে এল বেল বাজার আওয়াজ। পরম প্রিয়তমের আহ্বানেও বুঝি মানুষ অমনভাবে সাড়া দিতে পারে না, যেমন ত্বরিৎ গতিতে নেলা বলে উঠল: 'দেখি, দেখি, সরো।' বলে এমন এক ঝটকায় সরিয়ে দিলে আমায় যে, আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম। নেলা বললে: শিগগীর, উনি ডাকছেন আমায়—তাড়াতাড়ি, ধরে আমায় জানলায় তুলে দাও ত।' হতভাগা বেলটা তখনও বেজেই চলেছে। নেলা ছুটে গেল জানালার দিকে। ওকে ধরে তুলে দিলাম। টুক করে মিলিয়ে গেল সে। একটু বাদেই ভদ্রলোকের শোবার ঘরের জানালায় একটা আলো দেখা গেল। দেখি নেলা ওঁর কাছে। এবং এই সর্বপ্রথম ঈর্ষার দংশন অনুভব করলুম।

ওই রাত্তিরে লোকটার শোবার ঘরে কি ঘটেছিল আমার জানা নেই। তবে পরদিন সকালে নেলাকে জানালার কাছে দেখা গেল না। এমন কি দুপুরে খাবার পরেও ফোয়ারার কাছে সে এল না। তিন চার দিন এভাবে কেটে গেল। অবশেষে এক বিকেলে তার দেখা পেলুম। তবে একা নয়। বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় অসুস্থ ভদ্রলোকের পেছন পেছন তাকে ধরে নিয়ে সে আসছে। লম্বা ফরসাপানা মাঝবয়েসী ভদ্রলোকটির পরনে পাজামা, নেলার কাঁধে হাত রেখে ভর দিয়ে আছেন। সস্নেহে নম্র ভঙ্গিতে নেলা ভদ্রলোকের

কোমর জড়িয়ে আছে, সাবধানে ওর পা মিলিয়ে পা ফেলছে। ওদের দেখে তো আমি অবাক। চোখের আড়ালে ওরা চলে যেতেই একটা চাকরের দিকে তাকালাম। সে-ও ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সে এমন একটা ইশারা করল যার মানে দাঁড়ায়: 'দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়ে গেছে।' যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ওকে শুধোলাম, ব্যাপারটা কি? জবাবে জানলাম, ভিলাতে সবাই বলাবলি করছে ভদ্রলোক নাকি নেলাকে বিয়ে করতে চান। সত্যি বলতে কি একথা শোনার পর আর আমি জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। মনে মনে বুঝে গেলাম, আর পাঁচটা মেয়ের মতই নেলা-প্রেমের চেয়ে পয়সার দামই ওর কাছে বেশী। আমার আবার আবেগের বশে কাজ করে ফেলার অভ্যেস এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য স্থির করতে খুব বেশি চিন্তা ভাবনাও করতে হয় না। সেদিনই জিনিস-পত্র গোছগাছ করে নিয়ে চিরদিনের তরে ভিলা ছেড়ে চলে এলাম।

এরপর দীর্ঘদিন নেলার কথা মনে পড়লেই মনে হত, সে তো আজ সেই ভদ্রলোকের অঙ্কশায়িনী। আজ সে ওই ভিলায় একজন নার্স মাত্র নয়, সর্বময় কর্ত্রী। এও মনে হত, ভদ্রলোক এখন অসুস্থ হয়ে পড়লে নেলা আর আগেকার সেই যত্ন নিয়ে ওর পরিচর্যা করবে না। যে উদ্দেশ্যে ওঁকে বিয়ে করা, ওঁর বিধবা হিসাবে সেটা সফল হবে। কিন্তু উদ্দেশ্য বা অনুভূতি, এ-নিয়েই মানুষ বাঁচে ভাবলে ভুল করা হয়। এমন মানুষও আছে যে উদ্দেশ্য বা অনুভূতি দ্বারা চালিত হয় না, সম্পূর্ণ আলাদা কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়-যে কারণ সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন একজন এই নেলা।

বছর দুয়েক বাদে ওই ভিলায় আবার গেছি। ট্রপিকাল চারাগাছের একটা কাঁচঘর সাজাবার কাজে আমার ডাক পড়ে। হল ঘরে বসে থাকতে থাকতেই কেন একটা অদ্ভুত আবহাওয়া যেন টের পেলাম। প্রায় যেন শোকের পরিবেশ। জানলাগুলো সব বন্ধ, ফিসফিস করে কথা বলা, লোকের আনাগোনা ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, চাপাস্বর। হঠাৎ দেখতে পেলাম নেলাকে। সিঁড়ির মাথায় নার্সের বেশে। শেষবার ওকে যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম। মাথায় রুমাল জড়ানো, চোখে চশমা, হাতে একটা ট্রে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল সে, কাজেই দেখা হয়েই গেল। আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললাম: 'কী ব্যাপার নেলা, এখনো নার্স হয়েই আছো?—তোমার না বিয়ে

হবার কথা শুনেছিলাম?' আমার কথার সুরে কিছুটা ব্যঙ্গ, কিছুটা বিপদ মেশা ছিল। নেলা তার সেই শান্ত এবং দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল: 'শুনলে কোথায় কথাটা?—তোমায় বলেছি না আমি মোটেই বিয়েটিয়ে করতে চাইনি, শুধু নার্স হয়ে থাকতেই চেয়েছি?' বলি: 'আঙুর ফল টক।' বিশ্বাস করবেন কি? এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সে বললে: 'তবে শুনবে, ইনিও আমার প্রেমে পড়েছেন।···সব কথা বলার এখন সময় নেই—এখানে কাজ করতে এলে পরে কথা হবে—আমি থাকি একতলায়, বাগানমুখী ঘর।' যাবার আগে যে কটাক্ষ সে হেনে গেল তার মানে করলে দাঁড়ায়: 'তাহলে ওই কথাই রইল, কেমন?' আমার তখন মনে হল, নিজে অমন সুস্থ সবল বলেই বোধ হয় সে অসুস্থ লোকের সঙ্গে প্রেম করে বিশেষ ধরনের আনন্দ পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত আমি স্বাস্থ্যবান, তাই কোনো আশাই নেই আমার। কাজটা আর হাতে নিলাম না, এবং ডাক আসার আগেই চুপি চুপি বেরিয়ে গেলাম সেই বাড়ি থেকে।

◻ মারিও ◻

ঘটনার শুরু এইভাবে। খুব ভোরে উঠে পড়েছি, ফিলোমেনা তখনো ঘুমে। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম চুপি চুপি। চলে গেলাম ম'তে পারিওলি, ভিয়া গ্রামসি-তে যেখানে একটা ফুটো বয়লার আমার সারাবার কথা। সরাই করতে কত সময় লাগল? তা ঘণ্টা দু'য়েক তো বটেই। কারণ নল বার করে আবার বসাতে হয়েছে। কাজ সেরে বাসে ও ট্রামে করে চলে এলাম ভিয়া দেই করোনারি-তে—এখানেই আমার দোকান। সময়ের হিসেবটা একবার দেখুন: ম'তে পারিওলিতে দু ঘণ্টা, এছাড়া যেতে আধঘণ্টা আসতে আধঘণ্টা—কুল্লে তিন ঘণ্টার মামলা। তিন ঘণ্টার মানে কি? আমার মতে, অবস্থা বিশেষে হয় বেশি, নয় ত কম। সীসের একটা নল সারাতে আমার লেগেছে তিন ঘণ্টা, আবার অন্য কারু হয়ত···

ঘটনা পরম্পরাগুলো সঠিকভাবে দেখা যাক। দেয়ালের নিচ দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ভিয়া দেই করোনারির মুখে বাঁক ঘুরতেই শুনি কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি ফেদে দাঁড়িয়ে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িতে থাকে ফেদে। বেচারী ফেদের পা দুটো বাতে ফুলে গিয়ে হাতির পায়ের মত হয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে বললে: 'উফ্, কী ঝড়ো হাওয়া বইছে আজ!···এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছ ত? বাজারের ঝুড়িটা ধরবে একটু?'

বললাম, 'স্বচ্ছন্দে ধরব।' যন্ত্রপাতির ব্যাগটা অন্য কাঁধে নিয়ে ফেদের ঝুড়িটা তুলে নিলাম। আমার পাশে পাশে হাঁটছে সে। ঢোলা লম্বা কোটের তলায় গোদা গোদা পা দুটো টেনে নিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে ফেদে শুধোলে: 'তা ফিলোমেনা কোথায়?'

বলি: 'কেন, বাড়িতে। আর কোথায় থাকবে সে?'

সে বললে: 'তা বটে···আহা, বেচারা।'

আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর বলি: 'আহা বেচারা কেন?'

আমার দিকে না তাকিয়েই বিদঘুটে বুড়িটা বললে: 'তোমার জন্যে দুঃখ হয় তাই।'

'তার মানে?'

'মানে, দিনকাল আর আগের মত নেই···আজকালকার মেয়েরা আমাদের কালের মেয়েদের মত নয়।'

'কেন?'

'আমাদের সময়ে পুরুষ মানুষ বউকে ঘরে রেখে নিশ্চিন্তমনে বেরিয়ে যেত·· বেরোবার সময় যেমন দেখে যেত ফিরে এসেও তেমনটিই দেখত বউকে·· কিন্তু আজকাল···'

'আজকাল কি?'

'আজকাল আর তেমনটা নয়·· যাক গে ওসব কথা·· আমার ঝুড়িটা দাও। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

ওই সুন্দর সকালটার সকল আনন্দ মুহূর্তে মরে গেল। ঝুড়িটা সরিয়ে নিয়ে বলি: 'আগে বলো এসব কথার মানে কি···ফিলোমেনার সঙ্গেই বা এর কি সম্পর্ক?'

'যা বললাম তার বেশি আর কিছুই আমি জানিনা। তবে কথাটা কি জানো, আগে থেকে সাবধান হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আর্ত চীৎকারে বলি: 'দোহাই তোমার, ফিলোমেনা করেছেটা কি খুলে বলো।'

'আদালগিসাকে জিজ্ঞেস করো', বলেই ঝুড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে সে প্রায় দৌড়েই চলে গেল।

ভেবে দেখলাম, এখন আর দোকানে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কাজেই আদালগিসার সঙ্গেই দেখা করতে রওনা দিলাম। ভাগ্য ভাল যে সেও থাকত ভিয়া দেই করোনারিতে। ফিলোমেনার সঙ্গে দেখা হবার আগে আদালগিসার সঙ্গেই আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আদালগিসা আর বিয়ে করেনি। কাজেই সন্দেহ হল, ফিলোমেনাকে নিয়ে এসব রটনা ওরই কীর্তি। পাঁচতলা ঠেঙিয়ে উঠলাম। দরজায় এমন জোরে আঘাত করলাম আর এত তাড়াতাড়ি দোরটা খুলে গেল যে আরেকটু হলে আদালগিসার মুখে গিয়েই ঘুঁষিটা লাগত। তার জামার হাতা গোটানো, হাতে ঝাঁটা সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'ব্যাপার কি, জিনো?'

আদালগিসা ছোটখাট দেখতে। তবে মাথাটা বেশ বড়সড় আর চিবুকটাও রীতিমত চোখে পড়ার মত। ওই চিবুকের জন্যেই ওকে ইস্কাবনের রাণী ডাকা হত। তবে মুখ সম্পর্কে অমন কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু তখন আমার মেজাজ এত খচে আছে যে আছে যে আমি বলেই ফেললাম: 'তাহলে ইস্কাবনের রাণী, তুমিই একথা রটিয়ে বেড়াচ্ছো যে আমি যখন দোকানে থাকি তখন ফিলোমেনা ঘরে বসে এমন কাজ করে থাকে যা তার করা উচিত নয়।'

রোষকষায়িত চোখে আমার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আদালগিসা বললে: 'ফিলোমেনাকে চেয়েছিলে—তাকে তুমি পেয়েছো।'

ভেতরে ঢুকে তার হাত চেপে ধরি। কিন্তু ধরেই ছেড়ে দিই, কারণ দেখি সে আমার দিকে আশার ভাব নিয়ে তাকাচ্ছে। বলি: 'তাহলে এসব তোমারই কাজ?'

'আমার কিছুই কাজ নয়—যা শুনেছি তাই শুধু বলেছি।'

'কার কাছে শুনেছো?'

'গিয়ান্নিনার কাছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ালাম। কিন্তু আদালগিসা আমার হাত ধরে ভাষাময় চোখে আমায় বললে: 'আমাকে ইস্কাবনের রাণী বলে আর ডেকো না।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলি: 'কেন, তোমার চিবুকটা কি কোদালের মত দেখতে নয়?'

বারান্দার রেলিং ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে বললে আদালগিসা: 'মাথায় এক জোড়া শিংয়ের চেয়ে কোদালের মত চিবুক ঢের ভালো।'

খুব খারাপ লাগছিল। কিছুতেই ভাবতে পারছি না ফিলোমেনা আমায় ঠকাতে পারে। আমাদের বিয়ে হয়েছে তিন বছর, এই তিন বছর ধরে সে যে আমায় নিবিড় করে ভালোবেসেছে। কিন্তু ঈর্ষা এমনই বস্তু যে, যা ছিল প্রেমের প্রকাশ সে সবই এখন ফেঁদে আর আদালগিসার কথা শোনার পর প্রবঞ্চনার রূপ নিয়ে দেখা দিল। যাই হোক, ওই রাস্তারই ওপর কাছের একটা দোকানে ক্যাশিয়ারের কাজ করে গিয়ান্নিনা। খুব ফরসা চেহারা, মসৃণ চুল আর নীল নীল চোখ। তাছাড়া, শান্ত, ধীরস্থির এবং চিন্তাশীল। ক্যাশ ডেসকের কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে তাকে বললাম: 'আচ্ছা আমি

যখন বাড়িতে থাকি না ফিলোমেনা তখন বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে, কথাটা কি তুমিই বলেছো ?'

গিয়ান্নিনা তখন খদ্দের সামলাচ্ছে। ক্যাশ-রেজিষ্টারের চাবি টিপে টিকিট বার করে গলা না চড়িয়েই সে বললে : 'দুটো কফি ⋯'

তারপর শান্তভাবে আমায় বললে : 'তুমি যেন কি বলছিলে, জিনো ?'

আমার জিজ্ঞাস্য আবার বলি। খদ্দেরের খুচরোটা মিটিয়ে দিয়ে সে বললে : 'আচ্ছা জিনো, আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ফিলোমেনা সম্পর্কে অমন একটা কথা আমি বলব, একথা ভাবলে কি করে তুমি ?'

'তবে আদালগিসা নিশ্চয়ই স্বপ্নে দেখেছে ব্যাপারটা !'

'না, তা নয়', সে বললে, 'আদালগিসা স্বপ্নটপ্ন দেখেনি⋯আমিও কথাটা বানাইনি, আমি শুধু পুনরুক্তি করেছি মাত্র।'

না বলে পারলাম না : 'কী দরদী বন্ধু !'

'অবশ্য আমি বলে দিয়েছি একথা আমি বিশ্বাস করি না⋯আদালগিসা নিশ্চয়ই সেটা তোমায় বলেনি।'

'বেশ, তবে বলো কথাটা তোমায় বললেটা কে ?'

'ভিনসেন্‌জিনা বলেছে ⋯এবং এ কথাটা বলার জন্যেই লণ্ড্রি থেকে সে এসেছিল।' আর কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে এলাম লণ্ড্রিতে। রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ভিনসেন্‌জিনা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে ইস্ত্রি চেপে কাজ করছে। ছোটখাট এক রত্তি মেয়ে ভিনসেন্‌জিনা, মুখটা বেড়ালের মত, রংটা বেশ চাপা, চটপটে ছটফটে। আমার প্রতি মেয়েটার দুর্বলতা আছে আমি জানতাম এবং আঙুল দিয়ে ইশারা করতেই সে ইস্ত্রি ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। খুশি খুশি গলায় বলল : 'সত্যি, তোমায় দেখে কী ভালো লাগছে জিনো !'

বলি : 'ওসব ছাড়ো। এখন বলো তো দেখি, আমি যখন দোকানে থাকি ফিলোমেনা তখন ঘরে বসে বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে একথা তুমি চারদিকে চাউর করে বেড়াচ্ছো, একথা সত্যি ?'

অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুলে দুলে সে খানিকটা হতাশ স্বরে বলল : 'তাই যদি সে করে, তাতে কি তোমার মনে খুব লাগবে ?'

বলি : 'আমার কথার জবাব দাও। তুমিই তাহলে এই জঘন্য কেচ্ছাটা

তৈরী করেছো?'

কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে সে বলল: 'বাবা বাবা, কি হিংসুটে তুমি। কোনো মেয়ে তার বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প গাছাও করতে পারবে না…?'

'হুঁম, তাহলে তুমিই—'

'সত্যি, তোমার জন্যে দুঃখ হয়,' পাজি মেয়েটা হঠাৎ বলে উঠল, 'তা তোমার বউকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাবো কেন, বলতে পারো? আমি বাবা কিছুই তৈরী করিনি…অ্যাগনেসই কথাটা আমায় বলেছে। সে এমন কি লোকটার নামও জানে।'

'নামটা কি?'

'তুমি বরং অ্যাগনেসের কাছ থেকেই জেনে নিও।'

এখন আর সন্দেহ রইল না ফিলোমিনা বাস্তবিকই ঠকিয়ে চলেছে আমাকে। এমন কি লোকটার নামও আমার অজানা নেই। অজান্তেই এই চিন্তাটা মনে এল যে ভাগ্যিস আমার ব্যাগে কোনও ভারী যন্ত্রতন্ত্র নেই, তা নয়তো মাথা গরম করে ফিলোমেনাকে হয়ত মেরেই ফেলতুম। কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না—ফিলোমেনা, আমার বউ, সে কিনা অন্য আরেকজনের সঙ্গে… চলে এলাম যেখানে অ্যাগনেস তার বাপের দোকানে বসে তামাক সিগারেট বিক্রি করে সেখানে।

কাউন্টারে পয়সা ফেলে দিয়ে বলি: 'দুটো নাজিওনালি দেখি।'

বছর সতেরোর মেয়ে এই অ্যাগনেস। একমাথা খাড়া খাড়া চুল। ফোলা ফোলা ফ্যাকাশে মুখে গোলাপী পাউডারের প্রলেপ এবং এক জোড়া কালো কালো চোখ। ওকে আমি চিনতুম, চিনত ভিয়া দেই করোনারির সকলেই। সকলের মত আমিও জানতুম মেয়েটার অসম্ভব ব্যবসাদারী মন, পয়সার জন্যে নিজের আত্মা পর্যন্ত সে বিকিয়ে দিতে পারে। আমাকে সে সিগারেট দিতেই ঝুঁকে পড়ে শুধোলাম: 'লোকটার নামটা কি?'

'কার নাম?' অবাক হয়ে সে বললে।

'আমার স্ত্রীর বন্ধুটির নাম।'

আমার মুখচোখের ভাবসাব নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধের ছিল না। কারণ মেয়েটা দেখলাম যেন বেশ ঘাবড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বললে: 'এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

হাসতে চেষ্টা করলাম। বললাম : 'আরে ওসব ছাড়ো দেখি, নামটা বলে ফেল। আর সবাই তো জেনে গেছে আমিই শুধু দেখছি জানি না।'

আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে মেয়েটা মাথা নাড়তে লাগল। কাজেই বললাম : 'ছাখো, নামটা বললে কিন্তু এটা তুমি পাবে।' বলেই পকেট থেকে এক হাজার লায়ারের নোটটা বার করে ফেললাম। সেদিনই সকালে মেরামতির কাজ করে টাকাটা পেয়েছিলাম।

টাকার গন্ধ পেয়েই মেয়েটা এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল যেন ওকে আমি প্রেম নিবেদন করেছি। ঠোঁট ওর কেঁপে কেঁপে উঠল, চারিদিকে তাকিয়ে নিল, তারপর নোটে হাতটা রেখে নীচু গলায় বললে : 'মারিও।'

'কেমন করে নামটা জানলে ?'

'আপনার বাড়ির দরোয়ানের কাছ থেকে জেনেছি।'

সুতরাং, ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। আমার মনে তোলপাড় চলছে। বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়েছি। একটু বাদেই আমার ফ্ল্যাটে ঢুকব। পা চালিয়ে যাচ্ছি আর ক'টা দরজা পেরোলেই আমার ঘর। মারিও নামটা মনে মনে আউড়ে চলেছি আর চোখের সামনে আমার পরিচিত সব মারিওর চেহারাই ভেসে উঠছে দুধওলা মারিও, কাঠের মিস্ত্রি মারিও, শাকশব্জী ও ফলওলা মারিও, একদা সৈনিক ও এখন বেকার মারিও, কশাইর ব্যাটা মারিও, মারিও, মারিও, মারিও · এক রোমেই বোধকরি বেশ কয়েক লাখ মারিও আছে এবং ভিয়া দেই করোনারিতেই আছে শ'খানেক। যে বাড়িতে বাস করি তার দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। সোজা চললুম দরোয়ানের ঘরের দিকে। ফেদের মতই সে বুড়ী এবং বেশ গোঁফ আছে। দু' পা ছড়িয়ে বসে আছে। দু' পায়ের মাঝখানে পা গরম রাখার ব্যবস্থা। কোঁচড় ভরতি চিকোরি। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা গলিয়ে বললুম : 'বলি, আমি বাড়িতে না থাকলে ফিলোমেনা মারিও নামে একটা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, একথা তুমিই রটিয়ে বেড়াচ্ছো ?'

বুড়ী বিরক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব : 'রটিয়ে কেউ কিছু বেড়াচ্ছে না···তোমার বউ নিজেই কথাটা আমাকে বলেছে।'

'ফিলোমেনা বলেছে একথা ?'

'সেই তো বলেছে, অমুক একটা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, নাম মারিও। জিনো বাড়িতে থাকলে দেখো সে যেন আবার এসে না পড়ে।

জিনো মা থাকলে যেন আসে···তা ছেলেটা তো এখন ঘরেই বসে আছে।

'ঘরে বসে আছে?'

'তবে আর বলছি কি···এই তো ঘণ্টাখানেক আগেই এসেছে।'

অতএব, মারিওর অস্তিত্ব আছে শুধু তাই নয়, এখন সে ফিলোমেনার সঙ্গেই রয়েছে। আমার ঘরেই কি না ঘণ্টাখানেক ধরে সে বিরাজ করছে। ছুটে গেলাম সিঁড়ির দিকে। পড়িমরি করে চলে এলাম সোজা চারতলায়। গিয়েই দরজায় ধাক্কা। দরজাটা ফিলোমেনাই খুলল। লক্ষ্য করলাম, যে কিনা সাধারণত খুবই ধীর খুবই শান্ত, তার মুখে আতঙ্কের ছায়া। বললাম : 'তাহলে আমি না থাকলে মারিও এসে তোমার সাথে দেখা করে।'

'কিন্তু এতে···?' ফিলোমেনা বলতে যাচ্ছিল।

'সবই আমি জানি', চেঁচিয়ে উঠি এবং ভেতরে ঢুকতে যাই। কিন্তু ফিলোমেনা পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল : 'এমনটা করছো কেন·· এতে তোমার কি ক্ষতিটা হচ্ছে শুনি? একটু বাদে এসো, লক্ষীটি।'

আর আমি পারলাম না। ফিলোমেনার মুখে এক চড় কষিয়ে দিলাম। চীৎকার করে বললাম : 'ও বাব্বা, ব্যাপার তবে গড়িয়েছে? এতে আমার কিছুই এসে যায় না, তাই না?' ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিয়ে ছুটে যাই রান্নাঘরের দিকে।

বাস্তবিক মেয়েদের গালগল্প আর মেয়েরা নিজেরাও বিধাতার কী বিচিত্র সৃষ্টি! টেবিলের সামনে ওই তো মারিও বসে বসে কফি খাচ্ছে। কিন্তু এ তো কাঠের মিস্ত্রী মারিও নয়, শাকসব্জী ফলওলা মারিও নয়, নয় কশাইর ছেলে মারিও, এমন কি বাড়ি আসার পথে যেসব মারিওর কথা ভেবেছি তাদের কেউই নয়। বসে আছে ফিলোমেনার ভাই মারিও। সিঁধেল চুরির দায়ে দু বছর জেল খেটেছে। একদিন জেল থেকে সে ছাড়া পাবে একথা ভেবে ফিলোমেনাকে বলেছিলুম : 'ভাখো একটা কথা বলি, তোমার ভাই কোনদিন আমার বাড়িতে আসে এ আমি চাই না। এমন কি তার নাম পর্যন্ত শুনতে চাই না আমি।' বেচারা ফিলোমেনা! চোর হলেও তার ভাইকে বড় ভালোবাসত সে। কাজেই আমি ঘরে না থাকলে সে ভাইর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত। আমার ওই রাগে অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে মারিও ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম : 'কি খবর, মারিও?'

নরম স্বরে সে বললে : 'আমি চলে যাচ্ছি · ভাববেন না, আমি চললুম··· তা ব্যাপারটা কী ? লোকে ভাববে আমার বুঝি প্লেগ হয়েছে !'

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তখন ফিলোমেনা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার শব্দ কানে আসছে। কি করেছি আমি, ভেবে লজ্জাই হচ্ছিল। কিছুটা বিব্রতভাবে বললুম : 'আরে না না, যাবে কেন। আজকের দিনটা থেকে যাও তাইতো, ফিলোমেনা, তাই না ?' ফিলোমেনা তখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে। ওর দিকে ঘুরে বলি : 'মারিও ওখানে ডিনার খাবে, কেমন ?'

ব্যাপারটাকে সহজ করে আনতে চেষ্টার ত্রুটি আমি করলাম না। এরপর ঘরে এসে ফিলোমেনাকে কাছে ডেকে নিলাম। চুমু খেলাম। আবার শান্তি ফিরে এল ঘরে। গাল গল্পের ব্যাপারটা কিন্তু তবু রয়ে গেল। একটু ইতস্তত করে মারিওকে বলি : 'এসো মারিও ··আমার কারখানায় চলে যাওয়া যাক— মালিককে বলে কয়ে কিছু কাজ হয়ত তোমার জুটিয়ে দিতে পারবো' আমার পেছনে পেছনে সে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলি : 'বলবে, তুমি এখানে নতুন—আগে তুমি মিলানে কাজ করতে বলবে, বুঝলে ?'

'ঠিক আছে।'

নীচে নেমে এলাম। দরোয়ানের ঘরের কাছাকাছি আসতেই মারিওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলুম : 'এর নাম মারিও— আমার শ্যালক—মিলান থেকে সবে এসেছে—আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে।'

'খুবই আনন্দের কথা, নিঃসন্দেহে—'

রাস্তায় নেমে আসতে আসতে ভাবি, আনন্দটা একান্তই আমার। কিছু মেয়েমানুষের কতগুলো বাজে কথা কানে তুলে হাজার লায়ার আমি খুইয়েছি, এবং এখন ঘরে এনে তুলেছি একটা চোরকে।